জীবনী শক্তি।





শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজু

জীবনী শক্তি।

(স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবনলাভ বিষয়ক
কয়েকটী কথা।)

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

কলিকাতা।

মধুরায় লেনস্থিত ১৬।৪ নং ভবনে, ইণ্ডিয়ান প্রেসে,
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৭

মূল্য ।৷০ আট আনা।

জীবনী শক্তি।

তাহার ক্ষয় ও সদ্ব্যবহার।

মুখবন্ধ।

সকলেই বলিয়া থাকেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই বনে গমন করা উচিত। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ", এই ঋষিবাক্যটী যে অনেক পরিমাণে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিলাতে একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে বিজ্ঞ চিকিৎসক হওয়া যায়, তাহার পর বিজ্ঞতম বা নির্ব্বোধ চিকিৎসক হইতে হয়। বয়সের কথা বলিলে, আমি পঞ্চাশের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছি। এখন যে এই পুস্তক লিখিতেছি, ইহাতে আমার বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা বা বাতুলতা প্রকাশ পাইতে পারে। যাহাই হউক, আমি এই পুস্তকে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিব, এবং সেই সকল বিষয়ে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত লোক সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। অনেক দিন এই পৃথিবীতে বাস করিয়া জীবনী শক্তির অনেক প্রকার অপব্যবহার প্রত্যক্ষ

করিয়াছি। ঈশ্বর-প্রদত্ত এই অমূল্য সম্পত্তির অপব্যবহার ও ক্ষয় করা ঘোরতর অন্যায় কার্য্য; অন্ততঃ, আমার মনে এইরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, কিরূপে শরীর রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, কিরূপে সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তৎসমস্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

অনেকেই বলেন, পুরাকালে আমাদের দেশের লোক দীর্ঘজীবী ছিলেন, এখন তাঁহাদের আয়ুক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এ কথা সত্য কিনা বলা বড় সহজ নহে। পূর্ব্বকালে এক গ্রামে অল্প-সংখ্যক লোক বাস করিত, তজ্জন্য কেহ বৃদ্ধ হইলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইত। আজ কাল কেহ তাহা বড় দেখিতে পান না বা পাইবার অবসরও পান না। আবার অনেকে সে বিষয়ের কোন প্রকার অনুসন্ধানও করেন না। সুতরাং উহা ঠিক করিয়া বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

বহু লোকের সহিত আলাপ পরিচয় ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি এবং এতদিন চিকিৎসা কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে আহার, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অযথা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা পরিপাকসম্বন্ধীয় পীড়া, মূত্র ও জননেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় পীড়া, মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় পীড়া প্রভৃতির যে বহুল

পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আজ কাল এরূপ যুবক অতি বিরল, যিনি চারি পাঁচ সের পরিমিত ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই বিদ্যা নানা বিষয়ে সঞ্চারিত করিবার শক্তি বিশেষরূপে উদ্দীপিত হয় নাই। আমরা এক্ষণে সকল বিষয়ই সহজে উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সেই উপলব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবার শক্তি এখনও সেরূপ বিকশিত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি তত্ত্ব আমরা অবগত হইয়াছি, তদ্বিষয়ক জটিল তত্ত্ব সমুদায়ও বুঝিতে আমাদের বড় অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু কাজে লাগাইবার শক্তি এখনও আমাদের হয় নাই। স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া একটী অল্পবয়স্ক বালকও ইহার সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা কোনই উপকারে আইসে না। অতএব আমরা যাহাতে কার্য্যকুশল হই, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। কারণ, কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে না পারিলে সংসারে উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে কেবল বক্তৃতাই করিয়া থাকি, কার্য্যতঃ কিছুই করি না। কিন্তু কেবল বক্তৃতা করিয়া কোন ফল হয় না। বক্তৃতাকালে মুখে যাহা বলা হয়, তদনুরূপ কার্য্য করিতে না পারিলে উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকাব অধিবাসিগণের অনুকরণ করা আমাদিগের

কর্ত্তব্য। তত্তৎ দেশের লোকেরা বক্তৃতাকালে মুখে যাহা বলেন, অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকার একটী প্রকৃত ঘটনা নিম্নে প্রকটিত হইল ঃ—

আমি যখন চিকাগো নগরে ছিলাম, তখন একদিন এক মহিলাসমিতির অধিবেশনকালে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মহিলা-দিগের গাউন ছোট হওয়া উচিত কিনা, এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, স্ত্রীলোকদিগের গাউন ছোট হওয়া উচিত।

পরদিন প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, অনেক মহিলার গাউন ছোট। আমার পরিচিত একটী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, মহিলাসমিতির কল্যকার অধিবেশনে এইরূপ ছোট গাউন পরিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এরূপ কার্য্যতৎপর না হইলে কি এ সকল জাতি এত উন্নত হইতে পারে?

এই পুস্তকে আমরা শরীররক্ষা, জীবনী শক্তির প্রকৃত ব্যবহার, অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় নিবারণ প্রভৃতি বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলেই আমরা নিরাময় হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিব। আমাদের দৈনিক কার্য্যকলাপ নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিলেই যে আমরা দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরমকারুণিক পরমেশ্বরের যে তাহাই উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

প্রথম অধ্যায়।

নানা কথা।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এক্ষণে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কি উপায়ে যে উহা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। নানা লোকে নানা দিকে ঘুরিতেছেন। দৈনিক ক্রিয়া কাণ্ড নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিলে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু তাহার অন্যথা হইলে অসুস্থ হইয়া উঠে। ভাল বিষয়েরও নিয়মিতরূপ চর্চ্চা না করিলে উহা অসুখের হইয়া পড়ে। ব্যায়াম করা উচিত, কিন্তু তাহারও অযথা অনুষ্ঠানে পীড়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, ব্যায়ামের বড়ই অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা স্কুলে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালি বালকেরা ইহাতে এরূপ অযথা অনুরক্ত হইয়া উঠে যে, শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। স্নান একটী স্বাস্থ্যকর বিষয়, কিন্তু তাহা সকল স্থলে উপযোগী নহে। ইহা বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদের শরীর একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া না চলিলে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না।

সম্প্রতি আমাদের দেশের আর একটী দোষ দেখা যাইতেছে। ইংরাজ বা অন্যান্য জাতীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহা সিদ্ধান্ত

করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তাহারই অনুকরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহাদের দেশের পক্ষে যাহা বিশেষ অনুকূল, আমাদের পক্ষে হয়ত তাহা বিশেষ অনিষ্টকর। ইহা আমরা আদৌ বিবেচনা করি না। এমন কি, আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমরা বিদেশীয়দিগের অযথা অনুকরণ করি। এই জন্য আহার, পরিচ্ছদ, কার্য্যকলাপ, সবই বিদেশীয় ধরণে গঠিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে দধিভোজন খুব প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা উপকারী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু সাহেবেরা তখন তাহা ব্যবহার করিতেন না বলিয়া আমরা তাহা বিষ-নয়নে দেখিতাম। অধুনা বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, দধি উত্তম জিনিষ, উহাতে কীটাণু সমুদায়ের ধ্বংস হয়, সুতরাং অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। এই কথা যেমন শ্রুতিগোচর হইল, অমনি আমাদের দেশীয় চিকিৎসক এবং যুবকেরা দধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দরিদ্র গোয়ালা বেচারারা বাচিয়া গেল। তাহাদের দুই পয়সা লাভ হইতে লাগিল। এই দধি যে আবার অনেক স্থলে দোষের হইয়া পড়ে, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা অনেক স্থলে, বিশেষতঃ জ্বর বিকার, কাশি প্রভৃতি রোগে দধি ব্যবহারে অনিষ্ট হইতে দেখিয়াছি। এই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিলাম। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দৃষ্ট হয়। আমাদের বাল্য-কালে মাংস ভক্ষণ করা তত প্রচলিত ছিল না। ইউরোপবাসীরা বলিলেন, মাংস ভক্ষণ না করিলে শরীর বলিষ্ঠ হয় না এবং দীর্ঘ জীবন লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অমনি আমরা অতিশয়

মাংসাশী হইয়া উঠিলাম এবং মাংসের এইরূপ অপব্যবহারজনিত নানা রোগে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। আবার এখন সেই ইউরোপ-বাসীরাই বলিতেছেন, মাংস আমাদের আহার্য্য নহে, নিরামিষ-ভোজনই যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর। আমরা অমনি আমাদের মত বদলাইয়া ফেলিলাম, আবার নিরামিষ আহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

কেহ যেন মনে না করেন যে, এরূপ মতপরিবর্ত্তন অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা এরূপ বলিতেছি। ইহা কখনই নহে। ভাল বুঝিতে পারিলে মত পরিবর্ত্তন করা কিছু দোষের বিষয় নহে, কিন্তু যেমন একটী বিষয় কর্ণগোচর হইল, অমনি বিশেষরূপে বিবেচনা না করিয়া, দেশ কাল পাত্র ভেদ না বুঝিয়া, একেবারে তাহাতে নিরত হওয়া উচিত নহে। কতকগুলি বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমরা অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত মত প্রচার করিতেছি। কীটাণু ও উদ্ভিদাণু আবিষ্কার ও তাহাদের দ্বারা নানাবিধ রোগোৎপাদন, ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহার দোষ এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, এই ভয়ে ভীত হইয়া লোকে আত্মীয় স্বজন ভুলিয়া যাইতেছে, রোগিসেবা ও দরিদ্রসেবা ভুলিয়া যাইতেছে। এইরূপ কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি একটা ছাত্রাবাসে এক ওলাউঠাগ্রস্ত রোগী দেখিতে যাই। তথায় গিয়া দেখিলাম, বাসা জনশূন্য। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, ওলাউঠা সংক্রামক রোগ, তাহার কীটাণু শরীরে কোনরূপে প্রবেশলাভ করিলে আর রক্ষা নাই, এই ধারণা প্রযুক্তই বাসার সকলে বাসা পরিত্যাগ করিয়াছে। দুঃখী

রোগীটীর মুখে একটু জল দেয় এমন লোক নাই।" বন্ধুবর ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সামান্য গল্প বলিয়াছিলেন। তাহা যখনই মনে হয়, তখনই সভ্যতাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। তিনি যখন এলাহাবাদে ছিলেন, তখন তথায় একটী উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর ওলাউঠা রোগ হয়। তাঁহার মেম ব্রজেন্দ্র বাবুকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করেন এবং যতবার ইচ্ছা আসিয়া দেখিয়া যাইবেন, এই বলিয়া বাড়ীর এক মাইল দূরে অবস্থিত একটী বাড়ীতে রোগীকে রাখিয়া আসেন। ব্রজেন্দ্র বাবু যতবার রোগীকে দেখিতে যাইতেন, তাহা মেমকে অবগত করাইয়া আসিতেন। দেখা শুনা ও শুশ্রূষাদির ভার দাস দাসীর উপর ন্যস্ত ছিল। ডাক্তারের টাকাও মেম সাহেব দিতেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রোগের আক্রমণের ভয়ে সেই যুবতী তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থিতি করিতেন। ইহা কিরূপ মানসিক ভাব! সাবধান হওয়া যেমন উচিত, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করাও কি তেমনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করা উচিত নহে?

মনের বল একটী বিশেষ শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে আমরা অনেক সময়ে উৎকট পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। আমাদের দেশে এই শক্তিটী বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আজও যে আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি, আমাদের এই মনের বলই তাহার প্রধান কারণ। অতএব এই শক্তিটী যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। এ দেশে প্রথমে যখন প্লেগের আবির্ভাব হইল, তখন কোন চিকিৎসকই এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে

দেখিতে যাইতেন না। রোগাক্রমণের ভয়ই তাহার প্রধান কারণ। সেই সময়ে আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, ওলাউঠা, বসন্ত, বিকার জ্বর প্রভৃতি রোগের কোনটাই কম সংক্রামক নহে। এই সমস্ত রোগীর চিকিৎসা যখন আমরা নির্ভয়ে করিতেছি, তখন প্লেগ-রোগীর চিকিৎসা কেন না করিব? এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি এই প্রকার রোগীর চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে কখনই হইত না যে, আমি এইরূপে রোগগ্রস্ত হইব। অবশ্য আমি সাবধান হইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া আহারাদি গ্রহণ করিতাম। আহারের সময়ে সাবধান না হইলে অনেক সময়ে এই সমস্ত ভীষণ রোগের বিষ শরীরস্থ হইতে পারে। আমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চিকিৎসা করিতে যাইতাম তাহা পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হস্ত পদ ধৌত করিয়া আহার গ্রহণ করিতাম, সুতরাং রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলাম।

মনুষ্যদেহ কি সুন্দর ও কিরূপ শক্তিশালী! শরীরের শক্তি নষ্ট না করিলে ইহা বড় সুন্দর দেখায় ও ইহা দ্বারা নানাবিধ গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া শরীরের শক্তিক্ষয় করে এবং দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা দ্বারা এই পৃথিবীর কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অসময়ে আহার গ্রহণ এবং অল্প বা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া জীবনী শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলেন এবং তাহার ফল এই হয় যে, যশ ও সম্মানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াও কাজের সময় অসুস্থ হইয়া

পড়েন। আমাদের দেশের চিকিৎসকেরাও যশ ও অর্থ উপার্জ্জনার্থ শারীরিক ও মানসিক শক্তির এতদূর অপব্যবহার করেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহাদের দায়িত্ব অধিক, সুতরাং শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। নিয়মিত সময়ে আহার গ্রহণ ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্রান্তি দূর করিয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা অনেক দিন সুস্থ ও সবল থাকিয়া নিজ কার্য্যের উন্নতি সাধন ও পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবেন, নতুবা তাঁহাদের শরীরের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।

পৃথিবীতে সকল দিকেই সঞ্চয়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অর্থসঞ্চয়, রাজার শক্তিসঞ্চয়, বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য সঞ্চয়, এমন কি, গৃহকর্ম্মেও সঞ্চয়ের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কেবল শারীরিক শক্তিসঞ্চয় ও শরীর-রক্ষার দিকে তত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই জন্যই আমাদের সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও বিশেষ চেষ্টা থাকিলেও আমরা কোন বৃহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারি নাই। ইহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র সেন যখন সাধনা ও প্রচার কার্য্যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া দেশের উপকার করিবার উপযুক্ত হইলেন, তখন তিনি শক্তিক্ষয় জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পাল যখন স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যশোলাভ করিলেন, যখন সকলেই তাঁহার

নিকট উপকারের প্রত্যাশা করিতে লাগিল, যখন তিনি দেশের নানাবিধ উপকার সাধন করিবার উপযুক্ত হইলেন, সেই সময়েই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইল, এবং জীবনী শক্তির ক্ষয় হওয়াতে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শারীরিক ও মানসিক শক্তির নিয়মিতরূপে পরিচালনা করিলে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভিষক্‌প্রবর বিহারী লাল ভাদুড়ী মহাশয় অবিচলিত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রভাবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং রোগনিবারণে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া যখন সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন, তখনই তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইল। দরিদ্র রোগীদিগের তিনি পিতা মাতা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কত লোক যে নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তিনি যদি শক্তি রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে হয়ত আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া কত লোকের উপকার করিতে পারিতেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেরও অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদের দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শক্তিক্ষয় করা কোন মতেই উচিত নহে। অত্যাচার করিয়া তন্নিবন্ধন কষ্টভোগ না করিলেও যদি জীবনী শক্তির এইরূপে হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং উহা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন আমরা নানা প্রকার চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন, কার্য্যচিন্তা পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করি বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় না।

যে আয়ু বা জীবনী শক্তির ক্ষয় হইয়াছে, তাহা আর পুনরানয়ন করা যায় না। এই জন্যই বলিতেছি যে শরীরের শক্তি রক্ষা করিয়া নিয়মিতরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বহুকাল ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক লোকের উপকার সাধন করিতে পারিব।

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিয়া কিরূপ দীর্ঘজীবী হন ও কিরূপ কার্য্যক্ষম থাকেন, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া সেই সকল কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে জীবনী শক্তির ক্ষয় হয়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। শরীর রক্ষা করিতে ও উহাকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে সমুদায় কুকার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্নান।

স্নান করিলে শরীর পবিত্র বোধ হয়। অমসৃণ বস্ত্র দ্বারা শরীর মার্জ্জনা করিয়া স্নান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এইরূপে স্নান করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আমরা আহারের পূর্ব্বে বেলা দশ, এগার বা বার ঘটিকার মধ্যে স্নান করিয়া আহার গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহা মন্দ নহে। অনেকে প্রাতঃস্নান করেন অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্নান করিয়া থাকেন। ইহাও মন্দ নহে। তবে রোগী বা দুর্ব্বল ধাতুর লোকের পক্ষে ইহা তত উপকারী নহে। এমন কি, অনেক সময়ে ইহাতে তাহাদের অপকার হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানের লোকের পক্ষেও প্রাতঃস্নান ভাল নহে। প্রাতঃস্নান করিয়া কার্য্যাদি করণানন্তর আর একবার স্নান করিতে না পারিলে শরীর ও মন ভাল বোধ হয় না। আবার দুইবার স্নান করাও অনেক সময়ে সহ্য হয় না। এমতাবস্থায় একবার স্নান করাই প্রশস্ত।

অত্যন্ত শীতল জলে বা অত্যধিক গরম জলে স্নান করা বিধেয় নহে। তাহাতে শরীরের শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, এবং দুর্ব্বলতা আনীত হয়। স্রোতের জলে স্নান করাই ভাল। নদীতে অবগাহন

করিয়া স্নান করিলে অনেক উপকার হয়। দুর্ব্বল ধাতুর লোকের পক্ষে অনেক সময়ে নদীতে স্নান করা সহ্য হয় না। তাহাদিগের গৃহমধ্যে তোলা জলে স্নান করাই উচিত। যেখানে নদী নাই, তথায় বৃহৎ পুষ্করিণী বা অন্য কোন প্রকার বৃহৎ জলাশয়ে স্নান করা কর্ত্তব্য। অধিকক্ষণ জলে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর, সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি হইতে পারে এবং তাহাতে দুর্ব্বলতাও আনীত হয়। শীতকালে এবং যখন তীক্ষ্ণ শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তখন গৃহমধ্যে আবৃত স্থানে স্নান করা কর্ত্তব্য, নতুবা অনেক প্রকার পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে।

স্নান সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা আছে। অনেকের বিশ্বাস, স্নান না করাই ভাল, অথবা প্রত্যহ স্নান না করিয়া দীর্ঘকাল অন্তর করা উচিত। বিজ্ঞানবেত্তারা বলেন, চর্ম্ম আমাদের মাংসপেশী ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির আবরণ। বাহ্যিক শীত ও উত্তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিবার প্রধান উপায় চর্ম্ম। চর্ম্মের এই ক্ষমতার হ্রাস হইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে সর্ব্ব শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। স্নান করিলে চর্ম্মের ক্ষমতার অপচয় হইতে পারে, সুতরাং স্নান করা উচিত নহে। তবে শরীর পরিষ্কার রাখিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের কবিরাজেরা সাধারণতঃ স্নানের বড়ই বিপক্ষ। তাঁহারা সহজে রোগীকে স্নান করিতে দিতে চান না এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আপনারাও বড় স্নান করেন না। শুনিয়াছি, আমাদের দেশের বিখ্যাত কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় বৎসরে কেবল দশহরা এবং মহা অষ্টমী তিথিতে মাত্র স্নান করিতেন। তিনি এত কম স্নান করেন কেন,

এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, সর্ব্বদা জল ব্যবহার করিলে দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, দেখুন, পাতকুয়ার দড়ি যে শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায়, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, উহাকে ক্রমাগত জলসিক্ত করা যায় বলিয়া উহার ঐরূপ পরিণাম ঘটে। দেহকেও যদি স্নানোপলক্ষে ক্রমাগত জলে বিধৌত করা যায়, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস, উহারও পাতকুয়ার দড়ীর মত পরিণাম হইয়া থাকে। বাস্তবিক, স্নানে এইরূপ অপকার সংঘটিত হয় কিনা তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদের বাস। এখানে স্নান বেশ সহ্য হয় এবং আমাদের বোধ হয় এখানে প্রত্যহ স্নান না করিলে অনেক অসুবিধা হইতে পারে; এমন কি, অপকার হইবারও সম্ভাবনা। তবে দুর্ব্বল ধাতুর লোকের পক্ষে, এবং রোগোপশমের পর দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকিলে অল্প স্নান করাই বিধেয়। এ বিষয় চিকিৎকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেই চলিতে পারে।

স্নানের বিপক্ষে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আরও অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, চর্ম্ম বিদ্যুৎ ও তাপ রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা বৈদ্যুতিক তেজ ও তাপ পরিচালিত হইতে দেয় না। জল বিদ্যুৎ-পরিচালক, সুতরাং চর্ম্মে জল লাগাইলে তাহার বিদ্যুৎ রক্ষার ক্ষমতা চলিয়া যায়, সুতরাং শরীরস্থ বৈদ্যুতিক ক্ষমতার অপচয় হয়। আমাদের ধারণা, সুস্থ ও সবলদেহ লোকদিগের স্নানে কোন অপকার হয় না, অথবা এত সামান্য হয় যে, তাহা

অপকার বলিয়াই গণ্য করা যায় না। কিন্তু রুগ্ন ও দুর্ব্বল ধাতুর লোকের ইহাতে প্রভূত অনিষ্ট হইয়া থাকে।

আর এক কথা এই যে, চর্ম্মের নীচে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড) আছে। সেই গ্রন্থি সকল হইতে তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া চর্ম্মকে মসৃণ ও তৈলাক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে চর্ম্ম অধিক শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাপরক্ষণে সমর্থ হয়। স্নান দ্বারা এ ক্ষমতার লোপ করিলে গাত্র থস্‌থসে হয় এবং সর্ব্বদা সর্দ্দি হইয়া থাকে। তৈল মাখিয়া স্নান করিলে এ অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর হয় বটে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে হয় না, সুতরাং যে সকল লোক সর্ব্বদা স্নান করেন, তাঁহাদের তৈল মর্দ্দন করা উচিত।

আজ কাল পুরি, ওয়াল্‌টেয়ার প্রভৃতি সমুদ্রতীরস্থ স্থানসমূহে অনেকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন এবং তথায় সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকেন। সকলেরই বিশ্বাস, সমুদ্রজলে স্নান করিলে শরীর বলশালী হয় এবং আরাম বোধ হইয়া থাকে। ইহা কতক পরিমাণে সত্য বটে। সমুদ্রজলে বৈদ্যুতিক তেজ (ম্যাগ্‌নেটিক পাওয়ার) অধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং ইহা শরীরকে শক্তিহীন করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ সমুদ্রে স্নান করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতে উপকারই পাইয়াছি। প্রাতঃকালে ৯টা বা ১০টার সময় সমুদ্রজলে পড়িয়া স্নান করা উচিত। অধিক সন্তরণ বা অধিকক্ষণ জলে থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে স্নানের উপকারিতার হ্রাস হইয়া আইসে এবং শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতি প্রত্যূষে স্নান সকলের পক্ষে উপযোগী নহে। ইহাতে সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি হইতে

পারে এবং শরীরও নিস্তেজ হয়। বেলা ৯টা হইতে ১২ টার মধ্যে স্নান করিলেই চলিতে পারে।

স্নানে আজ কাল সাবানাদি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও আমরা তত উপকারী বলিয়া মনে করি না, বরং ইহাতে অপকার হইতে দেখা যায়। সাবানে শরীরের তাপ অনেক নষ্ট হয়, সুতরাং দেহ সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইতে পারে। কেবল গামছা ও তোয়ালে দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিলেই চলিতে পারে। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত রাখিলে উপকার হয়। স্নান দ্বারা শরীরের যে তেজ উত্তেজিত হইয়া থাকে, বস্ত্র ব্যবহারে তাহা রক্ষিত হইতে পারে, নতুবা ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজে কাশি ও সর্দ্দির আক্রমণ হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আহার।

স্নানের অব্যবহিত পরেই পূর্ণ আহার করা উচিত নহে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে স্নানের পরই অল্প জলযোগ করিয়া কিছুক্ষণ পরে পূর্ণ আহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ইহা অতি উত্তম নিয়ম। স্নানের পর পাকস্থলী প্রভৃতিতে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে। সে অবস্থায় অধিক আহার করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হইতে পারে। এমন কি, অধিক শোণিতসঞ্চালনজনিত প্রদাহাদি পীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। স্নানের পর কিয়ৎক্ষণ মন স্থির রাখা কর্ত্তব্য, কোন প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। এই জন্যই স্নানের পর পূজা, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কার্য্যের আতিশয্য প্রযুক্ত ও অর্থলাভের চেষ্টায় আহারের সময়ের নিয়মরক্ষা-করণে কেহই উদ্যোগী নহেন। পূর্ব্বকালে হিন্দুরা দিবসে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিতেন এবং রাত্রিকালে অল্প আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন। অত্যধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন না থাকাতে এইরূপ আহারেই তাঁহাদের শরীররক্ষা হইত এবং শক্তিক্ষয়ও নিবারিত হইত। এক্ষণে ইহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অধুনা যাঁহারা আফিসে কার্য্য করেন, ইংরাজদিগের নিয়মানুসারে তাঁহাদিগকে প্রাতঃকালে কোন মতে তাড়াতাড়ি আহার গ্রহণ

করিয়া কার্য্যস্থলে যাইতে হয়। অতি প্রাতঃকালে এইরূপে আহার করা উচিত নহে। এই সময়ে পাকস্থলীর ক্রিয়া বড় প্রখর থাকে না। সুতরাং এই সময়ে অল্প আহার করিলে ক্ষতি নাই। দুই প্রহরের সময় প্রচুর আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে শরীর সবল ও পরিপাকক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আফিসের কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে এরূপ সময়ে আহার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্যই আমরা এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অপাক, উদরাময়, শূলবেদনা প্রভৃতি রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। বিদ্যালয়সমূহেও ১০টার পরই কার্য্য আরম্ভ করিবার নিয়ম থাকাতে ছাত্র ও শিক্ষকগণকেও প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি করিয়া আহার করিতে হয় এবং সেই জন্য তাঁহাদিগেরও এইরূপ নানাবিধ পরিপাক-ব্যাঘাত-জনিত পীড়া হইতে দেখা যায়। অন্যান্য লোক নিয়ম অনুসারে চলিলে এই সকল পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আহার করা উচিত। আজ এক সময়ে, কাল অন্য সময়ে আহার করিলে নানাবিধ পিত্তসম্বন্ধীয় পীড়া হইয়া থাকে। আহারের নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই যকৃতের ক্রিয়া উত্তেজিত হয়। অনেক সময়ে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া অন্ত্রের প্রথম অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেখানে খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত থাকিলে তাহাতে পিত্ত মিলিত হয় এবং পরিশুদ্ধরূপে পরিপাকক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে পিত্তরস অযথারূপে শোণিতে শোষিত হইয়া যায় এবং পিত্তের কঠিন পদার্থগুলি কঠিনতর আকার ধারণ করিয়া পাথরী উৎপন্ন করে। ইহাতেই

পিত্তশিলাজনিত শূলবেদনা হইয়া থাকে। এই পীড়া যে কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা যিনি একবার এই রোগে ভুগিয়াছেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর তাহা ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। এই স্থলে আমি আমার নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যখন আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতাম, আহার ও বিশ্রামের কোন নিয়মই পালন করিতাম না এবং করিতেও পারিতাম না। কিছুদিন পরে পিত্তশূল রোগ প্রকাশ পাইল। ঔষধাদি সেবনে রোগ আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু অনিয়ম করিলেই উহা আবার প্রকাশ পাইত। উদরে এত বেদনা হইত যে, নিঃশ্বাস আট্‌কাইয়া যাইত এবং প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হইয়া উঠিত। কিছুদিন পরে আমাকে আমেরিকায় গমন করিতে হইল। তথায় অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া ও আহারের অসুবিধায় একবার ঐ রোগ প্রকাশ পায়। সেই সময় আমি নিউইয়র্ক সহরের সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ফিস্কের নিকট গমন করিলাম। এই মহাত্মার আকার দর্শনে ও কথোপকথন শ্রবণে বুঝিলাম, ইনি একজন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। তিনি আমার পীড়ার সমস্ত কথা শুনিয়া প্রথমেই আমাকে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা অমূল্য। সকল যুবা পুরুষ ও কার্য্যশীল ব্যক্তিরই সেই উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

তিনি প্রথমেই বলিলেন, সকল বিষয়েই নিয়ম রক্ষা করিয়া না চলিলে উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি এত অল্প বয়সে

পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে যে জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, ব্যাধির পীড়নে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না, হয়তঃ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ও সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার সুবিধামত একটী সময় স্থির করিয়া লইবে এবং প্রত্যহ সেই একই সময়ে আহার গ্রহণ করিবে এবং উপযুক্তরূপ বিশ্রাম করিবে। এইরূপ আহারের নিয়ম প্রতিপালন ও উপযুক্তরূপ বিশ্রাম করিলে তুমি রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে এবং তোমার পরিবারের, দেশের ও সাধারণতঃ সকলেরই উপকার করিতে পারিবে। এই মহাত্মার প্রদত্ত এক মাত্রা ঔষধ সেবন করিয়াই আমি রোগমুক্ত হইলাম এবং তাঁহার আদেশমত আহারাদির নিয়ম পালন করিয়া অদ্যাবধি (প্রায় ১৯ বৎসর) সুস্থ ও সবল শরীরে রীতিমত কার্য্য করিতে পারিতেছি, আর রোগ প্রকাশ পায় নাই। আমি যখন তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবলকায় যুবকের শরীরের মত দেখিয়াছিলাম। তিনি শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়ম এত যত্নে পালন করিতেন যে, তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি গভীর্গবেষণাপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর আহারীয় দ্রব্যাদির বিষয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব যুক্তিপূর্ণ। খাদ্যদ্রব্যগুলিকে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

শরীরের উপরে ইহাদের ক্ষমতাদির বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট এই সমস্ত খাদ্যাদির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাত্ত্বিক খাদ্যেই শরীর ও মন অতিশয় সুস্থ ও সবল থাকে, এবং ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া উহাদিগকে পবিত্র করে। রাজসিক খাদ্য তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহাতে শরীরও তত সচ্ছন্দ থাকে না এবং ধর্ম্মভাবও তত উদ্দীপিত হয় না। তামসিক খাদ্য আরও নিকৃষ্ট।

পরিশ্রম করিলে শরীর ক্লান্ত হয়, শারীরিক অণু সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় পূরণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে হইলেই খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহাই খাদ্যগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জিহ্বার তৃপ্তিসাধনও আর একটী উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু প্রথমটী অর্থাৎ শরীরের শক্তিক্ষয়নিবারণই প্রধান। এমন অনেক খাদ্য আছে যাহাতে জিহ্বার তৃপ্তিসাধন হয়, কিন্তু পরিপাকসম্বন্ধীয় অনেক পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। অতএব তাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। দেশের অবস্থা এবং লোকের কার্য্যাদির উপরে খাদ্য নির্ব্বাচন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। যে দেশের যেরূপ জলবায়ু এবং যেখানে লোকে যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, তথায় খাদ্যদ্রব্য সেইরূপেই নিয়মিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়াই খাদ্যদ্রব্য স্থির করিতে হয়।

খাদ্যদ্রব্য ও আহার গ্রহণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, আমাদের দেশে তাহার কিছুই প্রতিপালিত হয় না। যাঁহারা সামান্য ডাইল ভাত, তরকারি, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি সহজ খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আহারের দোষজনিত কোন পীড়ায় বড় কষ্ট ভোগ করেন

না এবং প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এই প্রকার খাদ্যেই তাঁহাদের শরীরপোষণ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হয় ও জীবনী শক্তি প্রখরা ও দীর্ঘস্থায়িনী হয়। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা ও বৃহৎ বৃহৎ সহরের অধিবাসীরা পরিপাকক্রিয়ার দোষজনিত পীড়ায় যত কষ্ট পান, পল্লীবাসী ও সামান্য অবস্থার লোকেরা তত কষ্ট পান না। কলিকাতাবাসী এক ধনী ব্যক্তি অনেক দিন অপাক রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার একজন কর্ম্মচারী ঐরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। তাহা দেখিয়া এই ধনী ব্যক্তি আমাকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করেন। আমি তাঁহার ঔষধাদি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া, প্রাতঃকালে সহজে যে খাদ্য পরিপাক হয় অর্থাৎ অন্ন, মৎস্য, ডাইল প্রভৃতি, এবং সন্ধ্যার সময় রুটী বা লুচি ও মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি আহারের ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন, রাত্রিকালে তিনি মাংস, পোলাও প্রভৃতি আহার করেন। আমি তাহা নিষেধ করাতে তিনি বলিলেন, এরূপ হইলে তিনি আমার ঔষধ খাইতে প্রস্তুত নহেন। আমি বলিলাম, তাহা হইলে তাঁহার চিকিৎসা আমার দ্বারা হইবে না। পোলাও প্রভৃতি খাইলে উদরে বায়ু সঞ্চিত হয় এবং উদরাময় প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। ইহাতে ফল কি? তিনি বলিলেন, আমরা ওরূপ খাদ্য না খাইলে অনাহারে মরিব। আমি বলিলাম, এরূপ আহারে শীঘ্রই অজীর্ণ রোগে মরিতে হইবে। আমার চিকিৎসা তাঁহার মনোনীত হইল না এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণাদিতে আহারীয় দ্রব্য ও আহারের সময়, এই উভয়েরই যথেষ্ট অনিয়ম হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। আমি এক সময়ে এক মাস কাল চুনার সহরে বাস করিয়াছিলাম। সেখানে শরীর এরূপ সুস্থ ছিল এবং পরিপাকাদি উত্তমরূপে সাধিত হইয়া এত ক্ষুধা হইত যে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আসিবার দুই দিন পূর্ব্বে তথাকার ডাক্তারমহাশয় আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি সামান্য সহজপাক দ্রব্য আহার করি, ঠিক সময়ে আহার গ্রহণ করি, ইত্যাদি নানা প্রকার আপত্তি করিয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সামান্য সহজ খাদ্যের ও ঠিক সময়ে আহারের বন্দোবস্ত হইবে, এই কথা তিনি বলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার স্ত্রী আমার খাদ্যের এত প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, উপরি-উক্ত দুইটী নিয়মের একটীও রক্ষিত হইল না। আহারের বেলা অতীত হইয়া গেল এবং আহারও অতিরিক্ত হইল। সেই দিন রাত্রিতে আমার উদরে বায়ু সঞ্চিত হইয়াছিল। আহার বিষয়ে আমি বিশেষ সাবধান বলিয়া আর কোন বিশেষ অপকার হইল না।

আমাদের দেশে আজ কাল যে বহুমূত্র, সশর্কর মূত্র প্রভৃতি জীবনধ্বংসকরী পীড়ার অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আহারের অনিয়মই যে তাহার এক প্রধান কারণ তাহাতে আর সন্দেহমাত্রও নাই। আমরা আমাদের চিকিৎসা কার্য্যের প্রথমাবস্থায় বহুমূত্র রোগের এত প্রাদুর্ভাব দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। এখন দেখিতেছি, কি বালক, কি যুবা, কি

বৃদ্ধ, সকল অবস্থার লোকের বহুমূত্র পীড়া হইতেছে। একবার দার্জিলিংএ বেড়াইতে গিয়া একটী অতি সবল যুবা পুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার সঙ্গে অনেক দিন হইতে আমার পরিচয় ছিল। তিনি কেন দার্জিলিংএ আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তাঁহার বহুমূত্র রোগ (ডায়েবিটিস) হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা ভাল, চরিত্র ভাল, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা নাই অথচ তাঁহার ডায়েবিটিস হইয়াছে, ইহা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি আমার চিকিৎসাধীন হইলেন। সকল বিষয় অবগত হইয়া বুঝিলাম, অপাক রোগই তাঁহার মূত্রাধিক্য পীড়ার মূল। আহারাদির নিয়ম করিয়া দেওয়াতে এবং অতি অল্প মাত্র ঔষধ সেবনে তিনি রোগমুক্ত হইলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা এদেশীয় লোকের ব্যবহার যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লেখা হইয়াছে। অধুনা সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইউরোপ ও আমেরিকা-বাসীদিগের অনুকরণে আমরা কতকগুলি কু-অভ্যাসের দাস হইয়াছি। তাহাতে আমাদের জীবনী শক্তির অল্প অল্প করিয়া দিন দিন ধ্বংস হইতেছে এবং শারীরিক ক্ষমতা নষ্ট হওয়াতে আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। এই বিষয়ে দুই একটী কথা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য সকল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে ঐ সমস্ত সভ্য দেশের যে কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রযত্নে মাংসাদি আহার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা এতদূর বিলাসী হইয়া উঠিতেছি

যে, সেই সকল খাদ্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। আমরা নিম্নে নিতান্ত শরীরধ্বংসকর পানীয়গুলির বিষয় বিবৃত করিতেছি।

মদ্য।

মদ্য যে কি ভয়ানক পদার্থ তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মাদক দ্রব্য ব্যবহারে শরীর ও মন উভয়েরই বিকৃত অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। শরীর ও মনকে একটু উত্তেজিত ভাবে রাখিবার, একটু আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত থাকিবার, একটু স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত লোকে প্রথম প্রথম মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই জন্যই আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই তামাকুর ব্যবহার প্রচলিত আছে। নিতান্ত দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে তাড়ি প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে ও সভ্যতার অনুরোধে অধিকতর অনিষ্টকারী মদ্য সমুদায়ের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অর্থনাশ, শরীরক্ষয় ও নানাবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এ দেশীয়দিগের মধ্যে যে কেহ মদ্য পান করে, অল্প বা অধিক মাত্রায় এই বিষ উদরস্থ করে, তাহা দ্বারা সকল প্রকার ঘৃণিত কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। একটু সাময়িক উত্তেজনা, স্ফূর্ত্তিলাভ এবং আমোদ প্রমোদের অনুরোধে যাহারা মদ্যপান অভ্যাস করে, তাহাদের মত হতভাগ্য এ পৃথিবীতে কেহ আছে কিনা সন্দেহ।

যে কার্য্যে একটু আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তাহার

অনুষ্ঠান করা কি কর্ত্তব্য নহে? পৃথিবীর নানা প্রকার কষ্টে, সাংসারিক নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া যদি কোন উপায়ে কিছু আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেকে এই সমুদায় তেজস্কর দ্রব্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বা ঔষধ সেবনের ভাণ করিয়া বা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া অল্প মাত্রায় সুরা পান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার যে কি পরিণাম ঘটিবে, তাহা অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। এই আমোদ লাভ করিতে গিয়া কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সে দিকে অতি অল্প লোকেই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ইহাতে প্রথমে অর্থনাশ হয় এবং পরে শরীর নষ্ট হইতে থাকে। যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই আমোদ প্রমোদ লাভ করিতে হয়, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে। রোগপ্রতিকারার্থ অতি অল্প স্থলেই মদ্যের প্রয়োজন হয়। এ কার্য্য অন্য প্রকার ঔষধেও সম্পন্ন হইতে পারে। এই প্রকারে মদ্যপান অভ্যাস করাইবার জন্য চিকিৎসকেরাই বিশেষ দোষী। তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, অল্প পরিমাণে মদ খাইলে পাকস্থলীর উত্তেজনা হইয়া পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য হয়, এবং স্নায়ুমণ্ডলীর বলাধান ও দুর্ব্বলতার নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইতে দেখা যায় না। অল্প অল্প মদ্যপান অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তাহাতে কোন উপকার হয় না, মাত্রা বাড়াইতে হয়। এইরূপে মদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়াতে প্রকৃত মত্ততা উপস্থিত হইয়া যকৃতের রক্তাধিক্য, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারে এবং মস্তিষ্কের অবসাদ জন্য মানসিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

উত্তেজক ও মত্ততাজনক পানীয়ে প্রথমে উত্তেজনা হয়, পরে অবসাদ উপস্থিত হয়। এই শেষোক্ত অবস্থা দুর করিবার জন্য আবার মদ্য পান করিতে হয় এবং এইরূপে মদ্যপান অভ্যস্ত হইয়া যায়। এই মদ্য-তৃষ্ণা দূর করিতে হইলে ক্রমাগত মদ্যপান করিতে হয় এবং তাহাতে পরিশেষে শরীরক্ষয় হইয়া ও নানা যন্ত্রে রোগ প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু ঘটে।

মদ্যপানে যেরূপ অনিষ্ট হয়, গাঞ্জা প্রভৃতির ধূমপানেও সেইরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এ স্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা গেল না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মত্ততা-উৎপাদক কোন বস্তুই ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাতে লাভ অতি সামান্য, কিন্তু ক্ষতির ভাগ অত্যন্ত অধিক।

চা।

চাও আজ কাল আমাদের দেশে অধিক ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চা-পান মদ্যপানের মত তত অপকারী নহে, বটে, কিন্তু ইহা একেবারে দোষশূন্য নহে। চার বিপক্ষে কিছু বলিলে আমাদের দেশের অনেক লোকেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, চা-পানে কোন প্রকার অপকারই সংঘটিত হইতেছে না। সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন, অকারণে এরূপ দ্রব্য ব্যবহারের বিপক্ষে কেন আমরা বাক্যব্যয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিষাক্ত দ্রব্য সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবামাত্রই তাহার অপকারিতা প্রকাশ পায় ও শরীরের

ধ্বংস সাধিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্য অল্পে অল্পে শরীরনাশ করিয়া থাকে। চা এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিষাক্ত পদার্থ।

চা-পানটা বড়ই আনন্দজনক ব্যাপার। প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা পান করিলে শরীরের ও মনের স্ফূর্ত্তি হয় এবং কিঞ্চিৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া বড়ই আনন্দ প্রদান করে। পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চা-সম্বন্ধীয় হাস্যোদ্দীপক গানটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা বড়ই আমোদজনক।

চা।

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাহি, যশ মান চাহি না ;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোষ্ট" ডিম্ব থাকে, আপত্তিকর নয় তা ;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
স্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট সেরি আর, খাও যার খুসী যা ;
শুধু কেড়ে কুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা ;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার
সে, ঐ প্রাতে এক প্যালা চা।

মনুষ্যমাত্রেই অভ্যাসের দাস। যিনি যে বিষয় অভ্যাস করেন

তাহাতে তাঁহাকে এতই অভ্যস্ত হইতে হয় যে, তাহা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে না। এইরূপেই লোকে আফিং-খোর, চা-খোর, মদখোর ইত্যাদি হইয়া উঠে। আবার, একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা যায় না। মনুষ্য নানা প্রকারে যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ করে, আর কোন প্রাণীকেই সেরূপ করিতে দেখা যায় না। আমোদ প্রমোদের জন্য ও শরীর বলিষ্ঠ করিবার ছলে আমরা নানা প্রকার উত্তেজক বিষ উদরস্থ করিয়া আয়ু ও শক্তি ক্ষয় করিয়া থাকি। তাহা না করিয়া স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিলে জীবনী শক্তির সদ্ব্যবহার হয় এবং দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করিতে পারা যায়।

চা খাইলে লোককে সুরাপায়ীদিগের মত অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হইতে হয় না বটে, কিন্তু চা পান অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তাহা ছাড়িতে পারা যায় না এবং অতিরিক্ত চা শরীরস্থ হইয়া প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক পেয়ালা চা না পাইলে প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, অথবা উঠিয়া কোন কার্য্যে মন দিতে পারে না। ইহাকে কি নেশা বলা যায় না? চা-পানে স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়, আবার তাহার পরক্ষণেই অবসাদ প্রকাশ পায়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই অবসাদ নিবারণার্থ আবার চা পান করিতে হয়। এইরূপে অতিরিক্ত-চা-পান-জনিত বিষাক্ত অবস্থা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আমরা অনেক স্থলে চা-পান জন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বা নিউর্যাস্থিনিয়া রোগ হইতে দেখিয়াছি। চা-পান করিলে পাকস্থলীর অবসাদ উপস্থিত হয় ও অনেক প্রকার

রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চা-পানে ক্ষুধা নষ্ট হয় এবং উদরে প্রভৃত বায়ু সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। চা-পানের দোষে যে এরূপ হইতেছে তাহা মনে না করিয়া, লোকে অন্য কোন বস্তুর প্রতি দোষারোপ করে। অনেকের বিশ্বাস, চা শরীরের ধ্বংস নিবারণ করে। আপাততঃ ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। চা শরীরধ্বংসজনিত পদার্থগুলিকে বাহির হইয়া যাইতে না দিয়া অন্য স্থানে সঞ্চিত করিয়া দেয় এবং এইরূপেই বাত বা গাউট রোগ প্রকাশ পায়।

চা-পানে রক্তাল্পতা বা এনিমিয়া রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে আমাদের একটি যুবকের কথা মনে পড়িল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন কারণ নাই, রোগ নাই, অথচ শরীর দুর্ব্বল হইতেছে ও রক্তাল্পতা প্রকাশ পাইতেছে কেন? আমি অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম যে, তিনি চা-পানে অত্যন্ত আসক্ত। তাঁহার চা-পান বন্ধ করিয়া দিলাম এবং ঔষধ সেবন না করিয়াও তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আমাদের একজন রোগী বলেন যে, চা পান করিলেই তাঁহার মাথাধরা ছাড়িয়া যায়। ইহা অভ্যাসের জন্যই হইয়া থাকে। আফিং-খোরেরা আফিং না খাইলে অনেক প্রকার কষ্ট অনুভব করে, আফিং খাইবামাত্র তাহা দূর হয় বলিয়া কি আফিং খাওয়াকে মন্দ অভ্যাস বলিব না? চা সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। অতএব আমাদের পরামর্শ এই যে, এরূপ মাথাধরার রীতিমত চিকিৎসা করা উচিত। সাময়িক উপকারের জন্য চা-পানের দাস হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

আমাদের দেশে আজ কাল চার যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে। দুই বার, তিন বার, এমন কি অনেকে তদপেক্ষা অধিক বার চা পান করেন। চা-পান যে মস্তিষ্কের ও পরিপাকের ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাহা আমার নিজের শরীরেই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিলাত ও আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে আমি চা-পান করিতাম না। তখন প্রাতঃকালে কিছু খাইয়া রোগী দেখিতে যাইতাম, দুই তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ফিরিয়া আসিলে ভয়ানক ক্ষুধা হইত। পরে আমেরিকায় চা-পান অভ্যাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, চা খাইয়া বাহির হইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা হয় না। ইহা যে পরিপাকশক্তির ক্ষমতার অভাব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চা-পান ছাড়িয়া দিলাম, আবার সেইরূপ ক্ষুধা হইতে লাগিল। আমি দেখিয়াছি, একবাটী দুগ্ধে অতি অল্প মাত্র চা মিশাইয়া পান করিলেও আমার মাথা ঘুরিতে থাকে এবং নেশার ভাব উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে একটু আধটু চা পান করিলে কিছু ক্ষতি হয় না, তাহাতে অনেক সময়ে উপকার হইতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু চা-পানের অভ্যাস হইয়া গেলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ অনিষ্টকর দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল।

কাফি, তামাকু ইত্যাদি।

চা যেরূপ অপকারী, কাফি, তামাকু প্রভৃতি তদপেক্ষা কম অপকারী নহে। কেহ কেহ বলেন, কাফিতে চা অপেক্ষা কম অপকার হয়। আমার তাহা বোধ হয় না। বরং কাফি অধিকতর উত্তেজক

এবং মস্তিষ্কের উপরেই এই উত্তেজনা অধিক প্রকাশ পায়, সুতরাং মস্তিষ্কের পক্ষে ইহা অধিক অনিষ্টকর। কাফি খাইলে যে নিদ্রা হয় না, তাহা মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃই ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়াতে নিদ্রালুতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনেকের বিশ্বাস, কাফি খাইলে, নানাবিধ দূষিত দ্রব্য আহার করিলে যে অপকার হয়, তাহা হইতে পারে না। এই জন্যই অনেকে অতিরিক্ত আহারের পর এক পেয়ালা কাফি খাইয়া তাহার দোষ নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ এ চেষ্টা ফলবতী হয় বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে আর তাহা হয় না, কেবল অতিরিক্ত কাফি-পান-জনিত অপকারই হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের লোকেরা কাফি অল্পই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার দোষ বর্ণন বড় আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। চায়ের মত ইহাতেও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অপাক প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তামাক আমাদের দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক বার তামাক না খাইলে অনেকে কোন কাজই করিতে পারেন না। এই ধূমপান না করিলে অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। আবার আমাদের দেশে কাহারও বাটীতে কোন ভদ্র লোক আসিলে অগ্রে তাঁহাকে তামাকু সেবন করিতে দিতে হয়, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না। অনেকে তামাকু সেবন করিয়া অতি দুরূহ কাজ সকল সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তামাকুসেবনেও যে অনেক সময়ে অপকার হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

তামাকু হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট সাধন করে, সুতরাং যাহাদের

হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল অথবা যাহাদের বক্ষঃশূল বা এঞ্জাইনাপেক্টরিস রোগ থাকে, তাহাদের তামাকু সেবন করা কোন মতেই উচিত নহে। কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সাল্‌জার সাহেব প্রথম বয়সে অত্যন্ত তামাকুসেবী ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার বক্ষঃশূল রোগ প্রকাশ পায়। আমি তাঁহাকে তামাকু পরিত্যাগ করিতে বলিলাম। তামাকু পরিত্যাগ করাতে তিনি এ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য পীড়ায় ও দুর্ব্বলতায় তামাকু একেবারে নিষিদ্ধ।

যাঁহারা সর্ব্বদা সর্দ্দি কাশিতে কষ্ট পান, তাঁহাদের তামাকু সেবন করা উচিত নহে। ইহাতে সর্দ্দি কাশি বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাসনালী-গুলি বিকৃত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। তামাকু পরিপাক-ক্রিয়ারও ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া থাকে।

আরও কতকগুলি পদার্থ অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোকো তাহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত। ইহাও পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব সাবধানে ইহার ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে মত্ত হওয়া বা অভ্যস্ত হওয়া উচিত নহে। যাহারা অত্যন্ত কৃশ, যাহাদের শরীরে মেদের ভাগ অল্প, শরীর কেবল অস্থিচর্ম্মা-বশিষ্ট, তাহাদের পক্ষে কোকা উত্তম।

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে রাস্তাঘাটে অনেক পানীয় দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা পান করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। এই সকল পানীয়ে নানাবিধ মন্দ দ্রব্য প্রবিষ্ট হওয়াতে ইহারা অত্যন্ত অপকারী হইয়া উঠে। আর তাহাদের প্রস্তুত-করণ-প্রণালীও ভাল

নহে। আমাদের সম্রাট জর্জ্জ যখন এ দেশে আগমন করেন, সেই সময়ে একটী যুবক রাস্তা হইতে জিঞ্জারেড ক্রয় করিয়া পান করিয়া টাইফয়েড রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেকের ওলাউঠা রোগ হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, আইসক্রিমে দোষ ছিল। যাঁহারা তাহা খাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই ওলাউঠা হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

শরীরচালনা, ব্যায়াম।

শরীর রক্ষা করিতে ও জীবনী শক্তিকে সতেজ রাখিতে হইলে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। শরীর চালনা করা উচিত, নতুবা শরীর রক্ষা হয় না। মনুষ্যশরীর একটী কল বিশেষ এবং ইহাকে নানা বিভিন্ন ভাবে নিয়মিত করা যাইতে পারে। শরীরস্থ একটী যন্ত্র যেরূপ কার্য্য করে, অন্য যন্ত্র তাহার বিপরীত কার্য্যে রত থাকিতে পারে অথচ শরীর রক্ষা হয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। আবার মানবমাত্রেই বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া নানা অবস্থায় সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারে। কল ভাল রাখিতে হইলে যেমন তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, তাহাকে মধ্যে মধ্যে চালাইতে হয়, নতুবা মরিচা ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, মনুষ্যশরীর রক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা তাহা কর্ম্মঠ রাখিতে হয়। আমাদের দেশে ব্যায়ামের সদ্ব্যবহার বড় হয় না। অনেক লোক ইহাকে কোনরূপ কার্য্যকর মনে করেন না, তাঁহারা কথনই প্রকৃতরূপে শরীর চালনা করিতে চান না, আলস্যে কাল কাটাইতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল মনে করেন। আবার কতকগুলি লোক অতিরিক্ত ব্যায়াম করিয়া শরীরকে ক্ষীণ ও ভঙ্গপ্রবণ করিয়া তুলেন। কেহ কেহ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাতে শরীর নষ্ট হয়; আবার কেহ কেহ বা অতিরিক্ত শারীরিক

পরিশ্রম করিয়া জীবনী শক্তির ক্ষয় করিয়া ফেলেন। অনেকের বিশ্বাস যে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য একবারে সম্পন্ন করা যায় না, তাহাতে শরীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং মানসিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, নিয়মিতরূপে করিলে দুই প্রকার কার্য্যই উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে। মানসিক পরিশ্রমের পর উপযুক্তরূপ আহার ও বিশ্রাম করিয়া শরীরচালনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা হয়, তাহা অতীব দোষাবহ। বালকেরা মানসিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে শরীর এবং মন উভয়েরই অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। আর তাহারা ইহার চর্চ্চায় এত অধিক উন্মত্ত হয় যে, বিশ্রামাদির কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। এইরূপে তাহাদের জীবনী শক্তির ক্ষয় হইতে দেখা যায়।

যাঁহাদের শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, তাঁহাদের ব্যায়াম করাই উচিত নহে। যাঁহারা রোগভোগের পর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যত স্থির থাকিবেন, পেশী প্রভৃতির চালনা যত কম করিবেন, ততই অধিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

মুগুর ভাঁজা, ডাণ্ডো প্রভৃতি ব্যায়াম বড় ভাল নহে। ইহাতে শরীরের পেশীসমুদায়ের অতিরিক্ত চালনা হওয়াতে অনিষ্টই হইয়া থাকে। পেশী বর্দ্ধিত ও শক্ত হইলেই যে শরীর অতিশয় স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়, এরূপ মনে করা ভুল। আমাদের দেশের মল্লগণ উপরি-উক্ত প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা শরীর অতিশয় শক্ত করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাদের জীবনী শক্তি দীর্ঘকাল ঠিক থাকে না। ইহাদের প্রকৃত শক্তি ক্রত

অধিক দৃষ্ট হয় না। কোন প্রকার আঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তি ইহাদের তত থাকে না। ব্যায়ামচর্চ্চা প্রযুক্ত ইহাদের হৃৎ-পিণ্ডের বিবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা ইহাদের থাকে না। আমরা প্রসিদ্ধ মাল গোলামীকে দেখিয়াছি। তাহার শরীর কঠিন, এবং পেশীসমুদায়ের দৃঢ়তা অতি আশ্চর্য্য ছিল, কিন্তু একটু পরিশ্রম হইলেই সে হাঁপাইয়া পড়িত। তাহার ওলাউঠা পীড়া হয় এবং ক্ষণকালের মধ্যে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া শরীর শীতল হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতার লোপ হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম। কেহ কেহ ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিও ভাল বলিয়া থাকেন। প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য্যাস্তের সময় কতকদূর ভ্রমণ করিলে শরীর বেশ সুস্থ থাকে। কিন্তু ভ্রমণও অতিরিক্ত ভাল নহে, বিশেষতঃ রোগীদিগের পক্ষে ভ্রমণ যত অল্প হয়, ততই ভাল। এ স্থলে আমার এক বন্ধুর বিষয় উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর গত হইল, আমার এই বন্ধুর যকৃৎ ও মূত্রসম্বন্ধীয় পীড়া এবং জ্বর হইয়া শোথের অবস্থা প্রকাশ পায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা তাঁহার রোগ অসাধ্য বলিয়া স্থির করেন। এই অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া আমার চিকিৎসা-ধীন হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার রোগ আরোগ্য হইয়া আসিল। তখন তাঁহার শরীর সবল করিবার জন্য তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ মধুপুর পাঠাইয়া দিলাম। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইল। শরীরে বল হইল, এবং মুখ-মণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন,

তখন আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অল্প অল্প বেড়াইতাম। কিন্তু মধুপুরে গিয়া বলবৃদ্ধি হওয়াতে তিনি অত্যন্ত অধিক বেড়াইতে লাগিলেন এবং শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। পরে একদিন এত অধিক ভ্রমণ করিলেন যে, তাহার পর হইতেই তাঁহার শরীর আবার অসুস্থ হইতে লাগিল। জ্বর, বাত, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হইল এবং তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এতদূর মন্দ হইল যে, তাঁহাকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। যে ভ্রমণকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম বলিয়া আমরা বর্ণনা করি, তাহাও অতিরিক্ত হইলে অপকার ঘটিতে দেখা যায়। স্থূল কথা, রোগমুক্তির পর, এবং দুর্ব্বল ধাতুর লোকের পক্ষে অল্প ব্যায়াম করা উচিত। পরিশুদ্ধ বায়ুতে অল্প অল্প বেড়াইলেই কার্য্য সাধিত হয় এবং শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।

বলবান্ লোকেরা নানা প্রকার ব্যায়াম করিতে পারে, কিন্তু কেবল পেশীগুলির অতিরিক্ত চালনা করা উচিত নহে, এবং যে প্রকার ব্যায়ামে শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং জীবনী শক্তির অযথা ক্ষয় হয়, সেরূপ ব্যায়াম করা একান্ত অবিধেয়। উকীল, বিচারক, ডাক্তার ও সরকারী কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। তাঁহারা যখন পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন, তখন কার্য্যান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবেন। পরে আহারান্তে উপযুক্তরূপ বিশ্রাম করিয়া ভ্রমণাদি অল্প-আয়াসকর ব্যায়ামচর্চ্চা করিবেন। তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য হইতে মধ্যে মধ্যে অবসর গ্রহণ করা এবং সেই অবসরকালে

কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে ও ভ্রমণাদিতে কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

দেশভ্রমণ সম্বন্ধেও দুই এক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। যাঁহারা কেবল নানা স্থান দেখিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্থানান্তরে গমন করেন, তাঁহাদের ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান উচিত নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, স্বাস্থ্যলাভ হয় না। তাঁহাদের পক্ষে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় গিয়া নিশ্চিন্তমনে কিছু দিন অবস্থান করা কর্ত্তব্য। সেখানে তাঁহারা যদি নিয়মিত ভ্রমণ, লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়ম সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করেন, তাহা হইলে উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারেন। অনেকে স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের শরীরের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। তাঁহারা বলেন, স্বাস্থ্যকর স্থানে যখন আসিয়াছি, তখন নিয়ম পালন আবার কি করিব? আবার অনেকে এই সমস্ত স্থানে দুই চারি দিন থাকিয়াই সম্পূর্ণ উপকারের প্রত্যাশা করেন, তাহা না হইলেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসেন। ইঁহারা জানেন না যে, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে অধিক দিন না থাকিলে সেই স্থানের জলবায়ুর উপকারিতা উপলব্ধি করা যায় না।



পঞ্চম অধ্যায়।



চিকিৎসা ও ঔষধ সেবন।

চিকিৎসা ও ঔষধ সেবন বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। বিবিধপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ও অধিক মাত্রায় নানাবিধ ঔষধ সেবন করিয়া অনেকে অনেক সময়ে শক্তিক্ষয় ও জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া থাকেন। আবার অনেক সময়ে রীতিমত চিকিৎসার অভাবে অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই দুই অবস্থাতেই আমাদের দেশের লোক চির-রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন যাপন করেন।

অনেক লোকের মনের ভাব এইরূপ যে, কোন রোগ না থাকিলেও চিকিৎসক আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট নানাবিধ কাল্পনিক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক। শরীরের পুষ্টিসাধন করিবার ও মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার নিমিত্ত, এবং অন্ত্রের অবস্থা ভাল থাকিবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমরা কোন স্থানের এক রাণীর চিকিৎসা করি। তিনি নক্স ভমিকা ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই ঔষধের উপর তাঁহার এরূপ ভক্তি জন্মিল যে, তিনি আমার ঔষধালয় হইতে পাঁচিশ শিশি নক্স ভমিকা ক্রয় করিয়া লইয়া যান। এই ঔষধ তিনি গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সেবন করিবেন, এই

তাঁহার উদ্দেশ্য। আর এক ধনবান্ ব্যক্তির মাতার এক প্রকার কবিরাজী তৈল মর্দ্দন না করিলে শরীর ভাল থাকিত না ও রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। এই তৈল অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া গৃহে রাখিতে হইত। শুনিলাম, যে কবিরাজ ঐ তৈল প্রদান করিতেন, তিনি বৎসরে কেবল ঐ তৈলের জন্য সাত আট শত টাকা পাইতেন। ধনী লোকদিগের গৃহিণীদের মধ্যে সুখসেব্য একটা ঔষধ ব্যবহার করা চাই, নতুবা তাঁহাদের শরীর ভাল থাকে না। আজ কাল গৃহস্থ লোকেরাও নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে ঔষধ-বিক্রেতাদের বেশ লাভ হয় বটে, কিন্তু এইরূপে অযথা অধিক পরিমাণে ক্রমাগত ঔষধ সেবন করিলে শরীরের অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ হইয়া আইসে, তাহা অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

রোগ হইলে ঔষধ সেবন দ্বারা সেই রোগের প্রতিকার করা আবশ্যক বটে, কিন্তু অল্পমাত্র ঔষধসেবনেই যে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, ইহা চিকিৎসকদিগের মধ্যেও অনেকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা ক্রমাগত ঔষধ পরিবর্ত্তন ও অধিক পরিমাণে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে অপকারই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ চিকিৎসায় রোগ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা আমাদের কল্পিত কথা নহে। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহারে রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে ও ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলে উপকার হয়। নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনাটী দ্বারা আমরা ইহা বুঝাইয়া দিতেছি।

বেহারের অন্তর্গত কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর

জ্বর হয়, প্রথম হইতেই সিবিল সার্জ্জন আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করেন। ঔষধে কোন উপকার হইল না, প্রতিদিন এক এক ডিগ্রি করিয়া জ্বর বাড়িয়া তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, রোগীর সাধারণ অবস্থাও মন্দ বোধ হইতে লাগিল। তথাকার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবুর পরামর্শ অনুসারে আমার এক বন্ধু চিকিৎসককে আহ্বান করা হয়। তিনি ঔষধের কোন ব্যবস্থাপত্র দিলেন না, নিজের বাটী হইতে ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। সিবিল সার্জ্জন শুনিলেন, এইরূপ চিকিৎসা হইতেছে। তখন তিনি আসিয়া ঐ চিকিৎসকমহাশয়কে প্রেস্‌ক্রিপ্সন্ দেখাইতে বলিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহাকে বলিলেন, আমি কি ঔষধ দিতেছি, তাহা বিশেষ কারণ বশতঃ এখন বলিব না। তাহাতে দুই চিকিৎসকের মধ্যে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। সেই দিন হইতে রোগিণীর অবস্থা ভাল বোধ হইতে লাগিল। তাপ অনেক কমিয়া গেল এবং রোগিণীও আরাম বোধ করিলেন। তিন চারি দিনে রোগিণী সুস্থ হইলে ব্যবস্থাপত্রগুলি ডাক্তার বাবু সিভিল সার্জ্জনের হস্তে প্রদান করিলেন। দেখা গেল যে, তিনি কেবল জল রং করিয়া খাইতে দিয়াছিলেন, কোন ঔষধ দেন নাই। সিভিল সার্জ্জন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার বাবু বলিলেন, যখন আমি দেখিলাম এত ঔষধ সেবন সত্ত্বেও রোগ বাড়িতেছে, তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, ঔষধেই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে, দুই এক দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া দেখা যাউক। ইহাতে রোগিণীর কোন বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ ঔষধ দিব না বলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যস্ত হইবেন, তজ্জন্যই এইরূপ করিয়াছি এবং ইহাতে বিশেষ ফললাভও হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডাক্তার বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, এরূপ চিকিৎসক অতি অল্পই দেখা যায়।

কোন সময়ে একজন হাইকোর্টের জজ পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য এক স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা সেই সময়ে তথায় গিয়া কিছু দিন ছিলাম। একদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন, অল্প অল্প জ্বর হইতেছে, ক্ষুধা কিছুমাত্র নাই, রক্তাল্পতা জন্য পদদ্বয় ও চক্ষুর পাতা প্রভৃতি ফুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, অনেক প্রকার ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিতেছেন, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না, বরং রোগের বৃদ্ধিই হইতেছে। আমি তাঁহাকে সমস্ত ঔষধ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলাম এবং বলিলাম, যদি রোগ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ঔষধ সেবন বন্ধ করিলেন। পাঁচ ছয় দিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রোগ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া রহিলেন এবং এক মাসের মধ্যে এরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন যে, আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে ও ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলে যে এত উপকার হয়, তাহা তাঁহার জীবনে তিনি কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই প্রকার পরামর্শ দিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সামান্য মস্তিষ্কে এ প্রকার জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে।

চিকিৎসাবিভ্রাট সম্বন্ধে কিছু লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে।

তবে এস্থানে একটী বিষয় না লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আজ কাল যে নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ চর্ম্মের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিয়া চিকিৎসা করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। শুনা গিয়াছে, অনেক স্থলে এরূপ চিকিৎসায় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এ প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ করা কোনও মতে উচিত নহে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এরূপ চিকিৎসকের প্ররোচনাবাক্যে মুগ্ধ না হইয়া সাবধান হইবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।



নানাবিধ চিন্তা ও ভাবনা।

চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা আমাদের জীবনী শক্তির যেরূপ ক্ষয় হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে যে চিন্তা থাকিবে না, তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু অনর্থক চিন্তা অনেক আছে, তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। বিপদ উপস্থিত হইলে অবশ্যই চিন্তা ও ভাবনা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিহ্বল হইয়া গেলেই বিপদের সম্ভাবনা। যে চিন্তা দ্বারা লোকের বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা হয়, তাহা তত ভয়ানক নহে। কিন্তু আমার বিপৎপাত হইবে, নানা প্রকার রোগ শোক উপস্থিত হইবে, এরূপ ভাবনায় নিমগ্ন হওয়া মূঢ়ের কর্ম্ম।

চিন্তার মত শারীরিক ও মানসিক শক্তিনাশক আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল কষ্ট ও বিপদ হইয়া গিয়াছে বা যাহা হইতেছে অথবা যাহা হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দুঃখিত ও বিমর্ষ হওয়াকেই বৃথা চিন্তা বলা যায়। ইহাতে কোন লাভ হয় না, বৃথা শরীর ক্ষয় হয় মাত্র। এই প্রকার ভয় ও চিন্তা হইতে নানাবিধ মানসিক পীড়া, কর্কট বা ক্যান্সার রোগ, বহুমূত্র বা ডায়েবিটিস প্রভৃতি জীবনধ্বংসকর রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আমাদের একজন ধনাঢ্য রোগী সর্ব্বদাই ভয় করিতেন

যে, তাঁহার ক্ষয়কাশির পীড়া হইবে। সামান্ত সর্দ্দি হইলেই তিনি ভয়ে ও চিন্তায় অভিভূত হইতেন এবং নানাবিধ ঔষধ সেবন করিতেন ও গৃহের দ্বার জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া গরম কাপড়ে শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভঙ্গপ্রবণ হইয়া উঠিল এবং শেষে তাঁহার প্রকৃত ক্ষয়কাশি রোগই উপস্থিত হইয়াছিল।

চিন্তা দুই প্রকার, এক প্রকার চিন্তাতে ব্যথিত ব্যক্তি আপনার দুঃখের কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্য প্রকার চিন্তাযুক্ত লোক আপন দুঃখ অন্যের নিকটে ব্যক্ত না করিয়া নিজের মনেই রাখিয়া দেন। এই শেষোক্ত প্রকার চিন্তা অতীব ভয়ানক এবং তাহাতে অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আপনাদের দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া চিন্তামুক্ত হইয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তিরা আপনাদের প্রভাব অধিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই চিন্তাতে অধিক প্রপীড়িত হয়েন। আমাদের একজন বিজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, বহুদর্শী চিকিৎসক সর্ব্বদাই মনে করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে চিকিৎসা কার্য্যের কি ভয়ঙ্কর দুরবস্থা উপস্থিত হইবে! এই ভাবনায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

অনেকে আবার সকল বিষয়েরই গম্ভীর ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন; হাসি তামাসা ও আমোদ প্রমোদ তাঁহাদের ভাল লাগে না। আমাদের কোন কোন সমাজের লোকদিগের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যে, তাঁহারা সামান্য ঠাট্টা তামাসাকে

ভয়ানক নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে চাহেন। তাঁহাদের অনেককে বলিতে শুনা যায়, 'তোমাদের এখনও বালকত্ব ঘুচিল না'।

কেহ কেহ বা আপনার সামান্য বিপদকে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের দুঃখের আর কিছুতেই শেষ হয় না। যিনি সামান্য মোকদ্দমা করিয়া কষ্ট পাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমার মোকদ্দমায় যেরূপ কষ্ট ও অর্থব্যয় হইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও হয় না। আমি বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি, অন্য কোন ব্যক্তির এরূপ ঘটিলে তাহার কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত বলা যায় না। এইরূপ এক ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, ওহে ভাই! এরূপ বিপদ তো সকলেরই হইয়া থাকে, ইহার জন্য এত চিন্তা কেন? গত বৎসর আমাদের পাড়ার যদুর এইরূপ বিপদ হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে তত কাতর হয় নাই, আর লোকের কাছে ক্রমাগত তাহা বলিয়াও বেড়ায় নাই। এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি রাগ করিয়া বলিলেন, ভাই! তাহার যদি আমার বিপদের অর্দ্ধেকও হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত। এই প্রকার লোকেরা আপনাদের অবস্থা দশ গুণ করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং অন্যের সেই অবস্থাকে সামান্য বলিয়া মনে করেন।

অনেকে আবার মনে করেন, 'আমার মত লোকের এইরূপ অবস্থা ঘটিল!' এই ভাবিয়াই আকুল। কলিকাতাবাসী কোন এক বনেদী প্রবীণ লোকের ভ্রাতার মৃত্যু হয়। বিষয় সম্পত্তি লইয়া সেই ভ্রাতার স্ত্রী নালিশ করিতে উদ্যত হন। আমাদের মত সম্ভ্রান্ত বংশের বধূর নাম আদালতে উঠিবে, এই ভাবনায় সেই প্রবীণ

ব্যক্তি এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, বিষপানে আপনার জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, ওরূপ বৃথা চিন্তা করিয়া কি হইবে, এরূপ করিও না, সচ্ছন্দচিত্তে আহারাদি করিয়া কালক্ষেপ করিতে থাক, তাহা হইলে সে আরও অধিক চিন্তার জর্জ্জরিত ও অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া উঠে। তাহার চিন্তার মাত্রা বাড়িয়া যায় এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ উপদেশ দেয়, সে নিতান্ত নির্দ্দয় লোক বলিয়া তাহার ধারণা হয়। এরূপ না বলিয়া বরং যদি তাহাকে বলা যায় যে, তুমি যেরূপ চিন্তা করিতেছ ও যত অধীর হইয়া পড়িয়াছ, সেরূপ চিন্তা করা বা অধীর হওয়া অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু উহা কিরূপ অপকারী তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। পরে যেরূপ হয় একটা উপায় করা যাইবে। এরূপ বলিলে অনেক সময়ে তাহার মন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পূর্ব্ব চিন্তাকে ভুলিয়া যাইতে পারে।

অনেক লোকের এরূপ স্বভাব যে, তাহারা সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অসুখী মনে করে। আমাদের দেশে যাঁহারা এক-কালে ধনী ও বিলাসী ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা মন্দ হইলে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে শুনা যায় যে, হায়! আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এখন কিরূপ হইয়াছে! সে সময়ে পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে কত আমোদ প্রমোদ হইত! ক্রমাগত এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা তাহাদের জীবনকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার আধার করিয়া তুলেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, অথবা যত্ন ও চেষ্টা করিয়া যাহাতে অবস্থার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে মনোনিবেশ

করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া অনবরত ভাবনা চিন্তা ও শোক প্রকাশ করিয়া শরীর ও মন অসুস্থ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। অনেকে আবার সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, এমন কি ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে। আমাদের বাড়ীতে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে বলিতেন, গ্রীষ্মকাল বড় কষ্টদায়ক, কোন সময়েই আরাম নাই, গরমে ছট-ফট করিতে হয়; ইহা অপেক্ষা শীতকাল ভাল। আবার শীতকাল আসিলে বলিতেন, ভাল বিপদ, হাত পা নাড়িবার যো নাই, একটু বাতাস সহ্য হয় না, গ্রীষ্মকাল তো ভালই ছিল। বর্ষার সময়ে বলিতেন, ক্রমাগত বৃষ্টি, বাহির হইবার উপায় নাই, রাস্তা ঘাট কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; ইহা আর সহ্য হয় না। ব্রাহ্মণ বড় খুঁতখুঁতে ও কোপনস্বভাব ছিলেন, সকল বিষয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এইরূপ লোকের সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে কোন না কোন অসন্তোষের কারণ থাকিবেই থাকিবে। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একটা না একটা অসন্তোষের কারণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত এবং তজ্জন্য তিনি ক্রমাগত বকবক্ করিতে থাকিতেন। তাঁহার জীবনে কোন সুখই উপলব্ধ হইত না।

এই সমস্ত অবস্থায় চেষ্টা করিয়া মনকে অন্য দিকে ফিরাইতে হয়, নতুবা জীবন দুঃখময় হইয়া উঠে। ভাবিব না বলিলে হয় না, মনকে অন্য কার্য্যকারী বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারিলে ভাবনা তিরোহিত হয়। আমাদের দেশে আর এক সুবিধা আছে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে পারিলে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। এই অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইদানীন্তন ইংরাজী-শিক্ষিত

যুবকেরা সম্মত নহেন, কিন্তু অনেক সময় কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে তাহা করিতে হয়। আমরা এ স্থলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে কোন যুক্তি প্রদর্শন বা তর্ক বিতর্ক করিতে চাহি না। কেবল এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইব যে, অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে অনেক সময়ে মানসিক স্থৈর্য্য ও সচ্ছন্দতা লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্যই আমরা এ স্থলে এ বিষয়ের অবতরণা করিয়াছি।

অদৃষ্ট অর্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা সমুদায় ঘটিয়া থাকে যে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাই না বা চিন্তা করিয়াও তাহার কার্য্য কারণ সমুদায় স্থির করিতে পারি না। এরূপ স্থলেই আমরা অদৃষ্টের উপর ঘটনাটী আরোপ করিয়া থাকি এবং এরূপ করিলে অনেক সময় শান্তি লাভ করিতে পারা যায়।

অদৃষ্টে বিশ্বাস করা যে একটা লজ্জার বিষয় তাহা আমরা মনে করি না। কোন কোন বিশেষ ঘটনার অস্তিত্ব সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। অদৃষ্ট বশতঃ, বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে উহা ঘটিয়াছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ ভাবিলে মন কতক পরিমাণে সুস্থির হইতে পারে, সন্দেহ নাই।



সপ্তম অধ্যায়।

দীর্ঘ জীবন লাভ।

দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার ইচ্ছা মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক। এমন কি, আজ কাল এ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক চলিতেছে এবং অনেক স্থলে আলোচনাও হইতেছে যে, অমরত্ব লাভ করা কি সম্ভবপর নহে? জর্ম্মাণদেশীয় একজন পণ্ডিত এই বিষয় লইয়া মাসিক সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে অমরত্ব লাভের কথা লিখিত আছে, এবং কতকগুলি লোক অমর হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিতও হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই সমুদায় বিবরণকে বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়া উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যাহাই হউক, এই সমুদায় কথা সত্য কি না এবং অমরত্ব লাভ করা সম্ভব কি না, এই বিষয় লইয়া আমরা এ স্থলে তর্ক বিতর্ক করিতে চাহি না। তবে চেষ্টা করিলে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, কেবল ইহাই আমরা এ স্থলে বলিতেছি।

কিছু দিন গত হইল, ফ্রান্সদেশীয় কোন পণ্ডিত এবং চিকিৎসক বৃদ্ধাবস্থা নিবারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। যৌবনা-বস্থাকে চিরস্থায়িনী করিবার জন্য তিনি ঔষধও আবিষ্কৃত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। তবে সে ঔষধের ফল যে বিশেষ

স্থায়ী ও কার্য্যকারী হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কোন বিশেষ ঔষধ বা বস্তুবিশেষ দ্বারা যে বার্দ্ধক্য নিবারিত হইবে, ইহা কথাই নহে। তবে শরীররক্ষার যে সমুদায় বিধি ও নিয়ম আছে, এবং যে গুলি স্বয়ং ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব নহে, সেই সমস্ত নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছে এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লোকের সংখ্যাও যে নিতান্ত অল্প তাহা নহে। আমাদের দেশেও সকলে বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালে লোকের আয়ুঃসংখ্যা অধিক ছিল। পঞ্জিকাদিতে লিখিত আছে, সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু অধিক ছিল। তৎপরে যুগ, যুগ হিসাবে আয়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ কম হইয়া আসিয়াছে। যদিও লেখা দেখিয়া এ সকলে বিশ্বাস হয় না, তথাপি লেখাটা যখন আছে তখন ইহার মূলে যে কিছু না কিছু সত্য ছিল তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

মনুষ্যমাত্রেই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া বর্দ্ধিত, উন্নত ও চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল ঘটনার সামঞ্জস্য রাখিতে পারিলে জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। তাহার বিপরীত ঘটিলেই আয়ুঃক্ষয় হইয়া আইসে এবং পরিশেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই সকল ঘটনাগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাহ্যিক ঘটনা ও কতকগুলি ভৌতিক বা আভ্যন্তরিক ঘটনা।

দৈনিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে গিয়া আমরা নানা বাহ্যিক ঘটনা ঘটিতে দেখিতে পাই। ভ্রমণ, ধাবন প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক কার্য্য করিতে গেলে আমাদের শরীরস্থ অণু সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

মানসিক ক্রিয়া দ্বারাও এইরূপ শরীরক্ষয় হইয়া থাকে। এই ক্ষয় নিবারণ করিতে পারিলেই অধিক দিন বাঁচিতে পারা যায়, আর তাহা না হইলেই শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আহার, বিশ্রাম, রৌদ্র, ও বায়ু প্রভৃতির সহায়তায় আমরা এই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। এ সমুদায় নিয়মমত না পাইলে শরীর ধ্বংসোন্মুখ হয়। ঋণ করিয়া তাহা শোধ করিতে না পারিলে যে দেউলিয়া হইয়া পড়িতে হয়, তাহা সকলেই জানেন।

আবার বাহ্যিক সমস্ত বিষয় নিয়মিতরূপ চলিলেও কখন কখন দেখা যায় যে, শরীর ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এরূপ স্থলে কতকগুলি ভৌতিক বা আভ্যন্তরিক কারণে এরূপ ঘটিতেছে বিবেচনা করিতে হইবে। এই সমুদায় আভ্যন্তরিক কারণ আমাদের মনের মধ্যে স্থায়ী ভাবে কার্য্য করে।

যে শক্তি অদৃশ্য ভাবে আমাদের জীবনে স্থায়ী হইয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকেই আমরা জীবনী শক্তি বা ভাইটেল পাউয়ার বলিয়া থাকি। এই জীবনী শক্তি নিয়মিত-রূপে চলিলেই আমরা সমস্ত কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারি। আর ইহার অনিয়মিত বা বিভিন্ন প্রকার গতি হইলেই রোগ প্রকাশ পায়। আবার ইহা অপ্রতিহত ভাবে কাজ করিতে পারিলেই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। এই জন্যই আজ কাল লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, অমরত্ব লাভ কেবল এইরূপেই হইতে পারে। সে যাহা হউক, জীবনী শক্তির প্রকৃত ব্যবহার হইলে যে রোগ প্রকাশ পাইতে পারে না, সুতরাং রোগজনিত জীবনক্ষয়ও যে হইতে পারে না, তাহা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জীবনী শক্তির অপচয়ই আভ্যন্তরিক কারণ স্বরূপ হইয়া আমাদের দেহ নষ্ট করিয়া থাকে। জীবনী শক্তিকে প্রখর রাখিতে হইলে শারীরিক ও মানসিক শক্তির নিয়মিতরূপ চালনা করা এবং যখন ঐ সকল শক্তির ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, তখনই তাহার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা একবার ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িলে তাহা পূরণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের লোকেরা সময়ে সময়ে এই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা না করাতেই কঠিন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং পরে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের দেশের ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ও আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। সুতরাং যখন সম্মান ও উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। উকীল ও চিকিৎসকগণ এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যখন যশস্বী হইয়া অর্থোপার্জ্জন ও লোকহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই নানা প্রকার পীড়া হইয়া তাহাদের শরীর ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম এইরূপ শরীরক্ষয়কর রোগ-নিবারণার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয় না; পরে যখন রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, তখন নানা প্রকার চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন, আহার বিহারের নিয়ম অবধারণ ও প্রতিপালন করা হয়, কিন্তু তখন জীবনী শক্তি এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, আর

ঐ সকল বা অন্যান্য নানাবিধ উপায় অবলম্বনে কোন ফল পাওয়া যায় না।

ইউরোপবাসীরা ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রত্যহ কার্য্য দ্বারা শরীরের যে বলহানি হয়, প্রত্যহ আহার, বিহার এবং বিশ্রাম দ্বারা তাঁহারা তাহা পূরণ করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য দীর্ঘ জীবনও লাভ করেন। একদিন আমি সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ময়দানের এত নিকটে থাকিয়াও তিনি বায়ু সেবন বা ভ্রমণ করিতে বাহির হন না কেন? ইহাতে শরীর ও মন উভয়েরই স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। তিনি অম্লানবদনে উত্তর করিলেন যে, কার্য্যের অত্যন্ত ভিড়, সুতরাং ভ্রমণার্থ ময়দানে যাইবার সময় হইয়া উঠে না। কিন্তু তাঁহার সমব্যবসায়ী পল, উড্‌রফ, ইভান্স প্রভৃতি সাহেবদিগকে আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বায়ুসেবনার্থ বাহির হইতে দেখিয়াছি।

একদিন আমি চিকিৎসকপ্রবর বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে গড়ের মাঠে গিয়াছিলাম। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, এত সাহেব মেম বেড়াইতে আসিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছ কি? ইতিমধ্যে একজন ধনাঢ্য বাঙ্গালী বাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। আমি বলিলাম, এই দেখুন একজন যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, এ ব্যক্তির বোধ হয় বহুমূত্র (ডায়েবিটিস) রোগ হইয়াছে এবং হয়তঃ চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছেন, তজ্জন্যই আসিয়া থাকিবেন। কথাটা ঠিক বটে। যখন রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখনই বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য

বিদেশ গমন ও ময়দানে ভ্রমণ ইত্যাদি আরম্ভ হয়। ভ্রমণাদি যে শরীররক্ষার্থ নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের ধারণা থাকে না। সম্প্রতি কিন্তু লোকের মনোভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, তথাপি কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও বিশেষরূপ হয় নাই।

দীর্ঘ জীবন লাভের প্রথম উপায় শৈশবে গর্ভাবস্থা হইতে মাতার ও আত্মীয় স্বজনের বিশেষ চেষ্টার উপর নির্ভর করে। মাতার শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে, তাঁহার স্বাস্থ্য অপ্রতিহিত থাকিলে, তবে শিশু সবল ও সুস্থকায় হইতে পারে। মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরে শিশুর শরীর ও মনের অবস্থা যে অধিক নির্ভর করে, তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। গর্ভাবস্থায় মাতা যদি কলহপ্রিয়, কোপনপ্রকৃতি এবং অসুস্থমনা হন, তাহা হইলে শিশু জন্মিয়া অবধি খিট্‌খিটে হইয়া থাকে। সে অতিশয় ক্রন্দন করে, তাহার পেটের অবস্থা মন্দ হয় এবং মাথা গরম হইয়া উঠে; এমন কি, আক্ষেপ বা তড়কা প্রভৃতিও হইতে পারে।

আবার যখন শিশু বড় হইতে থাকে, তখন তাহাকে বিশেষ যত্নে লালন পালন করিতে হয়, নতুবা নানাবিধ রোগ জন্য তাহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও আয়ুক্ষয় হইয়া আইসে। যত্নে লালন পালন করিতে হইবে বলিয়া শিশুকে অকর্ম্মণ্য করাও উচিত নহে। অনেকে আবার পাছে শিশুর পীড়া হয়, এই আশঙ্কায় তাহাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া রাখেন। ইহাতে তাহার শরীর আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাকে বায়ুপূর্ণ ও রৌদ্রময় গৃহে রাখা উচিত। পুরাকালে শিশুদিগের সর্ব্ব শরীর তৈলাক্ত করিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত

ছিল। এই প্রথা অতি উত্তম বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে না, এবং শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে। যে সকল আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে তৈলমর্দ্দনকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা আমাদের এ উপদেশমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবেন কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, বর্ত্তমান সময়ে সেই ইউ-রোপীয়েরাও তৈলমর্দ্দনের উপকারিতা স্বীকার করিতেছেন।

শিশু যখন বড় হইতে থাকে,তখন তাহার শরীর ও মনের প্রতিও পিতা মাতাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সময়ে শরীররক্ষা ও চরিত্র-গঠনের উপদেশ দান করিলে ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ভাল হইবার সম্ভাবনা। এরূপ না করিলে তাহার চরিত্র দূষিত, শরীর অসুস্থ ও মন বিষণ্ণ হইয়া পড়ে; এমন কি, শেষে অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে তাহার বিদ্যা শিক্ষারও উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে। এই সকল বিষয় নিয়মিতরূপে করিতে পারিলে তাহার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুখ সম্পদের আধার হইয়া উঠে। বিদ্যা শিক্ষা ও পাঠ সমাপন হইলে তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত করিতে হয় এবং এইরূপে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে বিবাহ দিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়।

বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বড়ই বিষম বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশে পিতা মাতারা পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ বিবাহের যে কি বিষময় ফল ফলিবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। আমাদের

মতে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া কথনই উচিত নহে। ইহাতে শারীরিক, মানসিক এবং বৈষয়িক প্রভৃতি সকল বিষয়েই অবনতি হইয়া থাকে। আজ কাল এ বিষয়টী অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে এখনও সম্যক্ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছেন না। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ দিয়া ও চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যবিবাহ নিবারণই উন্নতি সাধনের প্রধান সোপান। আজ কাল ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে আবার অন্য এক দোষ সংঘটিত হইতেছে। তাহাও পরিহার করা উচিত। প্রায়ই বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় শিক্ষিত যুবকেরা এবং এদেশীয় উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিবাহ করিতে অসম্মত। তাঁহারা আপনার আর্থিক অবস্থার অত্যধিক উন্নতি না করিয়া বিবাহ করিতে চান না। তাঁহারা যদি একেবারে বিবাহ না করেন, তাহাতে বিশেষ কোন কথা নাই; কিন্তু তাহা না করিয়া অত্যন্ত অধিক বয়সে তাঁহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহাতে দুই প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ শারীরিক অনিষ্ট, দ্বিতীয়তঃ অধিক বয়সে শিশু সন্তান লালন পালন করিবার কষ্ট ও তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগমন। অর্থই যে সকল সুখের মূল নহে, তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। বাল্যকালে বিবাহ করিলে যেমন আয়ুক্ষয় হয়, অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও প্রায় সেইরূপ অনিষ্টই সংঘটিত হইয়া থাকে।

ইহার পর প্রৌঢ়াবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে মানসিক ভাব খুব ভাল রাখিতে না পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ

করিতে পারা যায় না। এই সময়ে সকলেরই লোভ, মোহ অহঙ্কার প্রভৃতিতে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্তমনে কাল যাপন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহারা যদি এই সময়ে কেবল ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনে সময় ক্ষেপণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হন। মনের সঙ্গে জীবনী শক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনের অবস্থা ভাল থাকিলে, জীবনী শক্তি অপ্রতিহত ভাবে কাজ করিতে পারে, সুতরাং দীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বদা মানসিক চিন্তাতে ব্যাপৃত থাকিলে শীঘ্রই বার্দ্ধক্যাবস্থা আনীত হয় এবং মৃত্যুও শীঘ্র উপস্থিত হইয়া তাহার সকল চিন্তার শেষ করিয়া দেয়। অতএব স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে মানসিক চিন্তা ও দুর্ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হোমিওপেথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান ঊননব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শুনা গিয়াছে, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি রোগী পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বিবিধ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন ও অনেক পুস্তকের পুনঃসংস্করণ করিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মাণ সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারী অতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তিনি তাহাকে সেই রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত নহে, এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে এই কয়েকটী কথা মাত্র লিখিত ছিল—"যশ, অর্থ, মান্য এবং পাণ্ডিত্য

লাভ করিতে গিয়া জীবন নষ্ট করিও না"। কোন কর্ম্ম করিতে গিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করা উচিত নহে; অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া শীঘ্রই জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহাই এই উপদেশের অর্থ। হানিমান অনেক সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি নিজের জ্ঞান ও চেষ্টার প্রভাবে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শেষ কথা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে, শরীররক্ষা ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার যে সমুদায় উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, এবং আহার, বিহার, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদাদির সম্বন্ধে যে সমুদায় কথা সংক্ষেপে প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত কার্য্যে পরিণত করা অবশ্যই কষ্টকর, সন্দেহ নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, এ সকল কথা ভাল বটে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যে পরিণত করা অতীব কঠিন ব্যাপার। আমরা সাংসারিক লোক, আমাদের পক্ষে এ সমুদায় উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা অসম্ভব বলিলেও হয়। আমার এক সমব্যবসায়ী চিকিৎসককে এই সমুদায় নিয়ম পালনপূর্ব্বক আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছিলাম। তিনি স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদিগের দ্বারা এ সমস্ত নিয়ম কখনই প্রতিপালিত হইতে পারে না।

সত্য বটে যে, কোন ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে তাহাতে মন প্রাণ অর্পণ করিতে হয়। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ না করিলে উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া অতীব কঠিন। তথাপি চেষ্টা ও মন থাকিলে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা যায়। এ বিষয়ে ইউরোপবাসীরাই উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা সকল

কার্য্যেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, অথচ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদাসীন নহেন।

জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। তবে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতিশয় ধনাঢ্যের ন্যায় বাস করিতে অথবা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে গেলেই জীবনী শক্তির অত্যধিক ক্ষয় হইয়া থাকে। যে স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় অতিরিক্ত অর্থ-উপার্জ্জন-স্পৃহা বিসর্জ্জন করাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শারীরিক স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অর্থলাভ, বিদ্যোপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য তাহার পরে।

আমাদের একজন বন্ধুর কথা মনে হইলে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। তিনি প্রথমতঃ এম, এ পাস করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিলেন; পরে আমাদের সঙ্গে একত্র ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার পর আবার সর্ব্বোচ্চ এম, ডি উপাধিও প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই কলিকাতা মহানগরীতে অসাধারণ চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। আমি এই সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ভাই! এরূপ কঠিন পরিশ্রমে শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবে। তিনি এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফল যাহা হইল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। চারি পাঁচ বৎসর প্রাকৃটিস করিতে না করিতেই তিনি ভীষণ

বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পর যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, সেই কয়েক বৎসরই তাঁহাকে কেবল রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অতি অল্প বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথম হইতেই শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। আমরা যে সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই উপলব্ধি হইবে যে, নিয়মিতরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করা যায়। চেষ্টা থাকিলে এবং অভ্যাস করিলে ইহা সহজেই সাধিত হইতে পারে।

ইহার প্রথম উপায় সংযম-শিক্ষা। বাল্যকাল হইতে যদি সংযম-শিক্ষা হয়, তাহা হইলে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কার্য্যই নিয়মিতরূপে সাধন করা যায়। সংযম আর কিছুই নহে, অতিরিক্ত লোভ, মোহ প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা চালিত না হওয়া। আমাদের যে বৃত্তিগুলি আছে, তাহাদের অতিরিক্ত চালনা করিলেই শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া যায়। ইহাদিগকে নিয়মিতরূপে চালনা করিতে পারিলেই সংযম-শিক্ষা হয়। ইহা প্রথম প্রথম দুঃসাধ্য ও কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট থাকে না। বাল্যকালে যখন বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর থাকে, তখন যদি পিতা-মাতা ও আত্মীয়েরা যত্ন করিয়া সংযম শিক্ষা দেন, তাহা হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং দীর্ঘ জীবন লাভও হইতে পারে। যৌবনে যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে

হয়, তখন সংযমের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহা দ্বারাই অর্থোপার্জ্জন, যশোলাভ প্রভৃতি সকলই সম্পাদিত হইতে পারে, অথচ অকালে শরীরক্ষয় হেতু কালকবলে পতিত হইতে হয় না।

আমাদের যে সমুদায় ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদের সকলেরই প্রভূত কার্য্য আছে। রীতিমত কার্য্য করিয়া গেলে তাহারা সতেজ থাকে এবং শরীররক্ষার্থ যাহা আবশ্যক, তাহা সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। এই ইন্দ্রিয় সকলের অযথা ও অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে অসময়ে ধ্বংস উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এইরূপ অযথা পরিশ্রম করিয়া শরীরক্ষয় করিয়া ফেলেন। স্কুলের ছাত্রেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া মাথাধরা, মাথাঘোরা, পরিপাকের ব্যাঘাত, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া থাকেন। সুতরাং বিদ্যালাভ ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিলেও তাঁহারা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীর লইয়া সাংসারিক কোন কাজই করিতে পারেন না। তাঁহাদের অধীত বিদ্যা ও জ্ঞান কোন উপকারেই আইসে না। ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিবারাত্রি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা আপনাদের শরীর নিস্তেজ করিয়া ফেলেন এবং কেহ কেহ বা অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন। এরূপ ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসকদিগকে স্বার্থ ব্যতীত পরোপকারের জন্যও অনেক সময়ে পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। উহা অনিবার্য্য। যখন কোন দরিদ্রের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহার রোগক্লিষ্ট দেহ, সাংসারিক নানাবিধ অভাব ও অস্বচ্ছলতার বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করা যায়, তখন কোন চিকিৎসকই তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ বা সদ্‌ভাব প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। অন্যান্য ব্যবসায়ে এরূপ দয়া বা সদ্‌ভাব প্রদর্শন সহজে ততটা বুঝিতে পারা যায় না। কোন স্থলে অর্থ সম্বন্ধে কথা, কোন স্থলে বা শারীরিক সাধারণ কষ্ট সম্বন্ধে কথা হয়, সুতরাং তাহাতে মানসিক ভাবের তাদৃশ প্রাবল্য অনুভব করা যায় না। সেখানে সেই ব্যবসায়ী লোকের মন ততটা উত্তেজিত হয় না।

চিকিৎসকদিগের আর একটী অসুবিধা এই যে, রোগপ্রকাশের সময়ের স্থিরতা নাই। দুই প্রহর রাত্রির সময় যখন সকলেই নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, তখন হয়তঃ চিকিৎসককে রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং শরীররক্ষার জন্য যত্ন করা চিকিৎসকদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও বিশেষ যত্ন থাকিলে যে শরীর রক্ষা করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার মূলে যে একটী কথা আছে, আমরা সেটীকে আদৌ মনে স্থান দিই নাই। সে কথাটী শিক্ষা। ভারতবর্ষের লোকের, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদিগের প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না এবং এইরূপ শিক্ষা-লাভ না হইলেই নানা প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা এ স্থলে কেবল বিদ্যাশিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে শিক্ষা দ্বারা জীবন নিয়মিত করা যায়, কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে, সেই শিক্ষার কথাই বলিতেছি। এরূপ শিক্ষা আমাদের প্রায়ই হয় না। বাল্যকালে আমরা নিয়মিত সময়ে

আহার গ্রহণ, নিয়মিত সময়ে পাঠাভ্যাস, নিয়মিত সময়ে খেলা ও আমোদ প্রমোদ করা প্রভৃতি কোন কার্য্যই করি না। বাল্যকালে শরীরের ক্ষয় অধিক হয় না, সুতরাং তখন সে সমস্ত তত দোষের বলিয়া বোধ হয় না। সে সময় অনেক অনিয়ম সহ্য হইয়া যায়। তখন জীবনী শক্তি উন্নতির দিকেই ধাবিত হয়, সুতরাং শারীরিক বা মানসিক কোন অনিষ্টই হইতে দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষালাভ না হওয়াতে যৌবনাবস্থায় জীবনকে আর নিয়মমত চালাইতে পারা যায় না। তখন সকল দিকেই অনিয়ম-জনিত বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অতএব বাল্যকাল হইতেই প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। তখন পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে ভবিষ্যতে মনুষ্যজীবন গঠিত হয় না। আমাদের দেশের ধনী লোকদিগের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা ত একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধনীর সন্তানেরা যে কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইবেন, ইহা তাঁহাদের মনেই আইসে না। তাঁহাদের প্রভূত অর্থ আছে, তাহার সাহায্যে তাঁহারা সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম কোন ধনীর বা সম্পন্ন ব্যক্তির মুখাপেক্ষা করে না। সে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তজ্জনিত পাপের শাস্তি হাতে হাতেই পাইতে হয়। অর্থব্যয় বা অন্যবিধ চেষ্টায় কোন কিছুই হইয়া উঠে না। অতএব কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি যুবা, সকলেরই যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা

উচিত। এইরূপ শিক্ষালাভ করিলেই বা করিতে সক্ষম হইলেই জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, আপনার জীবনরক্ষার্থ এত অধিক যত্ন করা স্বার্থান্ধ লোকের কর্ম্ম। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে জীবন বৃথা। স্বার্থ কাহাকে বলে তাহা যদি আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের স্বার্থের সঙ্গেই অন্য লোকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। আমার স্বার্থত্যাগে অন্যের স্বার্থ সাধিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আমার শরীর সুস্থ থাকিলে তবেত আমি পরের উপকার করিতে পারিব। আমার অর্থ না থাকিলে কিরূপে অন্যের উপকার করিব? যে আমেরিকান্ চিকিৎসকপ্রবর আমার পীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তুমি ভাবিয়াছ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করতঃ তোমার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করিবে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসা করিয়া দীন দরিদ্রের উপকার করিবে, কিন্তু মনে রাখিও, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীর ভগ্ন করিলে সকলই শেষ হইয়া যাইবে। তুমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং হয়ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর যদি নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া কার্য্য কর, দীর্ঘকাল জীবিত থাক, তাহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনার ও অন্যের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। এস্থলে তোমার স্বার্থ এবং অপর লোকের স্বার্থ একই বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে তোমার স্বার্থপর হওয়া অতীব কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ লোকে আত্মবিসর্জ্জনকে নিঃস্বার্থতা শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা প্রকৃত বটে যে, কেবল আপনার স্বার্থের

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় কাজ করিলে তাহাকে নিঃস্বার্থতা বলা যায় না। আপনাকে বাঁচাইয়া পরের উপকার করাই যথার্থ নিঃস্বার্থতা। তাহা যে সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে, অনেকেরই সে জ্ঞান নাই। আমরা এই কলিকাতা নগরীর দুইজন সুবিখ্যাত চিকিৎসককে তাঁহাদের মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বেই নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। একজন রোগীদের দুঃখ দূর করিতে গিয়া, অসময়ে ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া, অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বলিয়াছিলেন, বিবেচনার ত্রুটিতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অসময়ে মৃত্যু আনয়ন করিয়াছি। ইহাও একপ্রকার আত্মহত্যা। আর একজন নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অসময়ে দেহত্যাগ করেন। তিনিও ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি সাবধান হইয়া চলিতেন, আজও জীবিত থাকিয়া আপনার ও পরের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপে সমস্ত কথাগুলি আর একবার বলিতে হইতেছে। শরীর রক্ষা করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, ইহাই আর্য্য ঋষিদিগের প্রধান ও প্রথম উপদেশ। সেই উপদেশ মত কার্য্য না করিলে ঋষিবাক্য উল্লঙ্ঘন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ-লঙ্ঘন-জনিত নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষবহিতো ভবেৎ॥

নগরী যেমন আপনার নগর রক্ষা করিতে ও রথী যেমন আপনার রথ রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, মেধাবী ব্যক্তি

সেইরূপ আপনার শরীরের হিতসাধন বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।

মহাত্মা চরক তাঁহার চিকিৎসা-সংহিতায় এই কথাগুলির স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব আমাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে শরীর রক্ষা করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতেও যিনি স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ঔদাস্য প্রদর্শন করেন, তাঁহার ন্যায় দোষী আর কেহই নহেন। শরীররক্ষা কার্য্য আমরা যে উত্তমরূপে সাধন করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের শরীর কিরূপে রক্ষা করা যায় ও কি প্রকারে উহা সবল থাকে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। আমাদের দেশের আচার, ব্যবহার, জল, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমাদের শরীররক্ষার্থ কোন্ কোন্ পদার্থের প্রয়োজন ও কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা না জানিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করা অতীব অন্যায়; তাহাতে শরীররক্ষা ত দূরের কথা, বরং নানাবিধ অপকার ঘটিয়া থাকে। এ দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ নিয়ম অবধারণ ও পালন করিতে হয়, তাহা আমরা এই পুস্তকে সরলভাবে বিবৃত করিয়াছি।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করিয়া শরীর সবল ও কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে পল্লীগ্রামে বাস করাই কর্ত্তব্য। সেখানে যথেষ্ট জমি পাওয়া যায়, তাহাতে উপযুক্তরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারা যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থাকাতে কেহই

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন না। তথাপি যত্ন করিয়া থাকিলে অনেকটা সহ্য হইতে পারে। নদী বা বৃহৎ জলাশয়বিশিষ্ট স্থানে বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহা হইলে পানীয় জলের এবং অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী জলের অভাব থাকে না। শরীরকে একটু কষ্টসহিষ্ণু করিবার চেষ্টা করা উচিত। একটু কষ্ট হইলেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এরূপ দেহ ধারণ করা দুর্ভাগ্যের বিষয়। অবস্থাবিশেষে ভ্রমণ, ধাবন ও নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা শরীরকে সবল রাখিতে হইবে।

নানাবিধ মানসিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হওয়া উচিত নহে। সর্ব্বপ্রযত্নে মানসিক অস্থিরতাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকে কল্পিত মানসিক কষ্ট আনয়নপূর্ব্বক জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলেন, ইহা বড়ই অন্যায়।

অত্যধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানা উপায়ে কোন বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত অবিধেয়। ইহাতে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া অসময়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়।

যে শিক্ষা দ্বারা শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, বাল্যকাল হইতেই সেইরূপ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। অধুনা এদেশে যেরূপ শিক্ষার বিধান বিদ্যমান আছে, তাহাতে শরীর ও মনের উৎকর্ষ লাভের উপায় অতি সামান্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনপূর্ব্বক যাহাতে সুখী হইতে পারা যায়, সেরূপ উপায় বিধান করাই শিক্ষার প্রধান ধর্ম্ম হওয়া উচিত।

